শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
LIBRARY
No. 11/290
BANARAS
PRESENTED

জ্যোতির্ময়

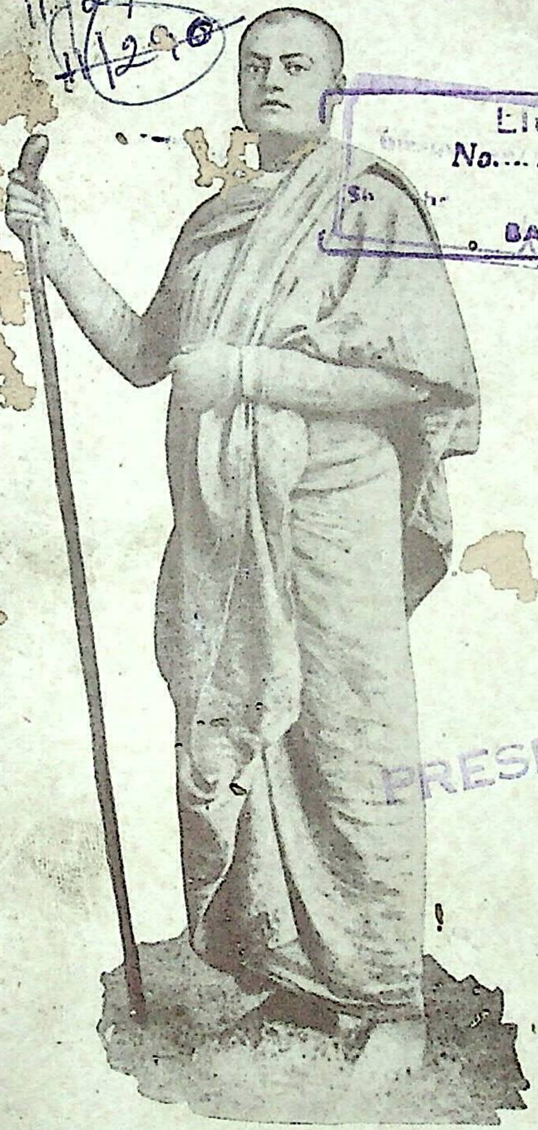

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্নিবোধত

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দ স্মরণিকা

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : সরিষা

THE TEST OF QUALITY

At any time, in any place, since the emergence of competitive enterprise, the quality of a product—tested continuously by that most critical of critics, the consumer—has made or marred the manufacturer's reputation. And a product, once firmly established by virtue of its Quality, is difficult to dislodge even in the intense price market of India, if that Quality is steadily maintained.

For more than a decade, Sen-Raleigh has been increasing its production of the well-known Raleigh, Rudge, Humber and Robin Hood bicycles. Yet their demand seems to be insatiable.

Sen-Raleigh manufactures, in addition to these bicycles, quality Union components and Wittkop saddles.

SEN-RALEIGH LTD.
CALCUTTA

SRC-84A

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 11/290
Ashram
BANARAS

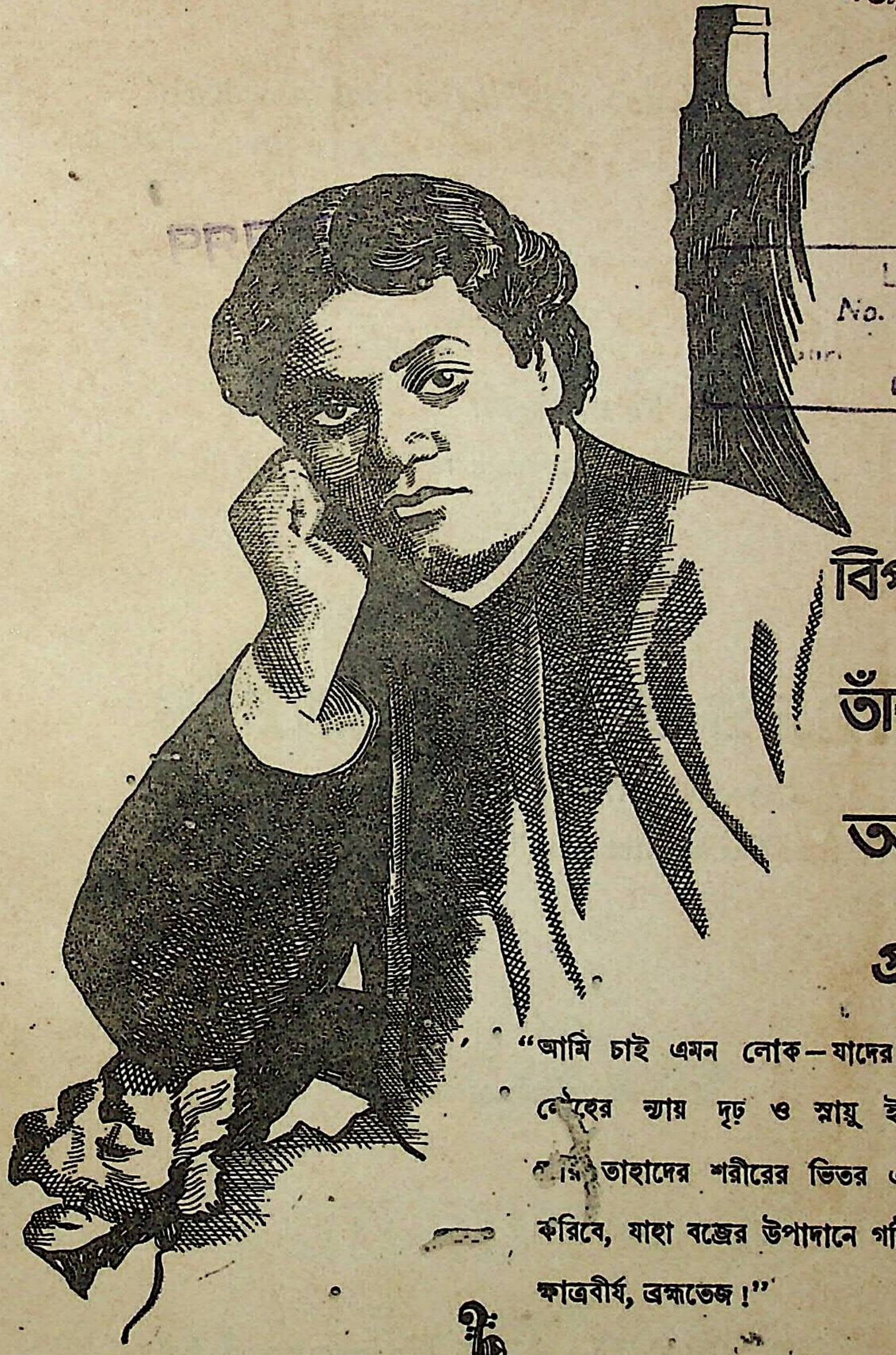

এই
বিপদসঙ্কুল
দিনে
তাঁর বানীই
হোক্
আমাদের
পথ
প্রদর্শক

"আমি চাই এমন লোক—যাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!"

"চাই মানুষ। অপর সবই জুটিবে, অভাব শুধু মানুষের।"

বোরোলীন হাউস কর্তৃক প্রচারিত

"Arise, Awake and stop not till the goal is reached"

—SWAMI VIVEKANANDA

To this spirit
most respectful homage is offered
by

KREBS & CIE PARIS

Consulting Chemical Engineers

38, Rue Parmentier-Neuilly-sur-Seine-France

And
Indian collaborators

Krebs & Cie (India) Private Ltd.

10, MIDDLETON ROW, CALCUTTA - 16

Gram : "SHOWERCOAT", Calcutta Phone : 44-6837 (2 Lines)

With the best Compliments

PRESENTED

of

DUCKBACK

BENGAL WATERPROOF WORKS (1940) LTD.

32, THEATRE ROAD

CALCUTTA - 16

Space Donated by

Howrah Motor Accessories Agency (Private) Ltd.

LARGEST IMPORTERS DISTRIBUTORS AND ENGINEERS.

Branches :
HOWRAH &
BHOWANIPUR (CAL)

3-1, MANGOE LANE.
post box 343,
CALCUTTA-1.

Workshop :
6, DOBSON ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-3083

VISIT

SPORTS EMPORIUM

33B, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-9.

Phone : 34-6925

★

OUR SPECIALITY

CRICKET, FOOT-BALL, VOLLEY BALL,
BASKET BALL, TABLE TENNIS,
BADMINTON, TENNIS,
GYMNASIUM & PLAY
GROUND APPARATUS.

Transmarine Traders

Dubashes : MARINE CONTRACTORS.

5, Commercial Buildings,
CALCUTTA-1.

Telephone : 22-7899 (*Office*)
45-1108 }
34-3175 } Res. Cable : "SHIPSUP"

EASTERN PAPER MILLS LIMITED

2, DAKSHINDARI ROAD,

CALCUTTA-48.

Telephone :
57-2496

Grams : **Eastrnpapr Calcutta-48.**

PRESENTED

LIBRARY No. 11/290 BANARAS

Machinery Division

UNDERTAKES DESIGNING AND MANUFACTURING, WITH JAPANESE TECHNICAL COLLABORATION, COMPLETE PLANT AND EQUIPMENT FOR PULP, PAPER AND BOARD INDUSTRIES. ALSO WORK AS PROJECT ENGINEERS & CONSULTANTS FROM THE STAGE OF FIELD SURVEY TO MARKETABLE PRODUCT.

Board Mill Division

MANUFACTURES QUALITY MILL BOARD, GREY BOARD AND SOLID CONTAINER BOARD IN FOURDRINIER AND CYLINDER MOULD TYPE MACHINES.

Gram : STEEL CHAIN

Phone : 56-3713

CHAIN MANUFACTURING ENTERPRISES

PRODUCERS OF QUALITY CHAINS SLINGS & OTHER ENGINEERING SPECIALITIES

Registered Office & Works

11, JADAB CHANDRA GHOSH LANE,

CALCUTTA-36.

"Do not fly away from the wheels of the world-machine, but stand inside it and learn the secret of work."

—SWAMI VIVEKANANDA

Telegram NIRPASHU

Phone : 33-4415

N. Ghosh & Co.

Hardware Merchants, General Order Suppliers and Govt. Contractors

Manufacturers of :

Bolts, Nuts, Rivets, Washers, G. I. Hooks Bolts and Machine Screws etc.

159, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA - 1

ANIL & SONS

Iron & Hardware Merchants & Manufacturers of :

Gate Grills & Rolling Shutters & General Order Suppliers.

41A, Nirmal Chunder Street, CALCUTTA-12

ভারতীয় ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন

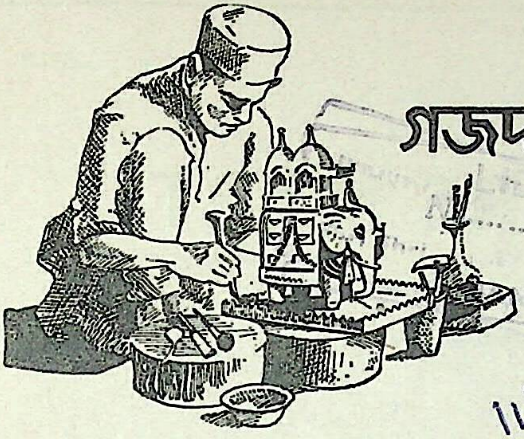

গজদন্ত শিল্প ভারতীয় শিল্পীর তৈরী হাতীর দাঁতের কাজ করা ছোট ছোট কারুশিল্পের তুলনা পৃথিবীতে দুর্লভ। এক ইঞ্চির এক দশমাংশ থেকেও ছোট একটি হাতীর মূর্তিকে নিঁখুতভাবে খোদাই করতে যুগ যুগ ব্যাপী বংশার্জ্জিত নৈপুণ্য ও শিল্পচেতনার প্রয়োজন। শিল্পকীর্ত্তির এই চরম নিদর্শনগুলি রাজারাজড়ার ইতিহাসের থেকে অনেক বেশী সততার সঙ্গে ভারতীয় মানসের অমরতার বাণী বহন করে চলেছে।

11|290

আর কেয়ো-কার্পিন মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্যকর কেশবিন্যাসের উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বেই।

কেয়ো-কার্পিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল যুগোপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে—এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ গুণ আর মৌলিক বর্ণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্নিগ্ধ সুরভি।

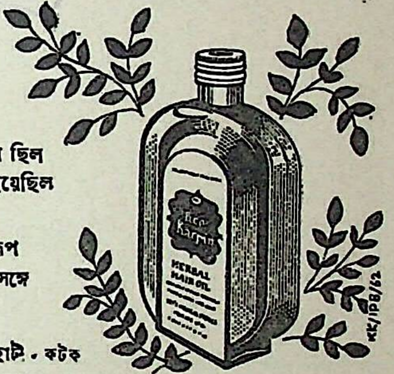

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

অক্ষয় কুমার লাহা

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

INDUSTRIAL

Paint

AUKHOY COOMAR LAHA

1, DHARUMTOLA St. : CALCUTTA-13

Insist on

DHAR RUBBER MFG. CO.

Howrah - Amta Road, Dassnagar

HOWRAH

*

for

Engineering Rubber Goods

Phone : 33-8910

HARDWARE MART

Govt. Contractors & General

Order Suppliers

159, NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-1.

Phone : 22-7248

M. C. & COMPANY

Approved Government, M. E. S. Contractors

and General Order Suppliers

★

24, STRAND ROAD, (2nd Floor)

CALCUTTA-1.

জ্যোতির্ময়

LIBRARY
No. 11/290
Ashram
BANARAS

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দ-স্মরণিকা

১৩৭০

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

সরিষা, চব্বিশ পরগনা

প্রকাশক :
স্বামী নির্মোহানন্দ
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সরিষা, চব্বিশ পরগনা

ব্লক :
অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

চিত্র ও প্রচ্ছদ মুদ্রক :
রিপ্রোডাকসান সিণ্ডিকেট
৭/১ কর্নোয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সংঘগুরুর আশীর্বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)
৪।১।৬৪

ফোন : ৬৬-৩৬১৯

LIBRARY
No.
BANARAS

স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া, ভারতের জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলেন, শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। যথার্থ শিক্ষা পাইলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে, চরিত্র গঠিত হয় এবং সে তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। সেইজন্য তিনি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সমন্বয় চাহিয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষকের সাহচর্য্যে থাকিয়া ছাত্রছাত্রীগণ প্রকৃত শিক্ষালাভ করিবে, ইহাই তিনি বিশেষভাবে চাহিযাছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তোমাদের আশ্রম হইতে যে বিশেষ সংখ্যা "জ্যোতির্ময়" বাহির হইতেছে—তাহা স্বামীজীর এই প্রাণপ্রদ ও বলিষ্ঠ ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করুক, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।

স্বামী মাধবানন্দ

MESSAGE

from

The General Secretary, Ramakrishna Math and Mission,
Belur Math, Howrah

RAMAKRISHNA MISSION
P. O. Belur Math, Dt. Howrah
31. 12. 1963

Phone : 66-2391

I am happy that the workers of the Ramakrishna Mission Ashrama, Sarisha, are bringing out a Souvenir in connection with Swamiji's Birth Centenary. I hope this Souvenir will contain useful articles of lasting interest on the various aspects of Swamiji's inspiring life and teachings.

Swamiji was a saint, a patriot, a lover of humanity, a philosopher and what not, but behind these various aspects of his personality was the real man, the man of realisation, a Brahmajnani. He brought the light of the Atman on every aspect of our national life and revitalised it. We should not forget this or fail to grasp it for this is his real personality which co-ordinates all his various aspects and synthesises his various teachings. I am sure your Souvenir will be a worthy tribute to Swamiji.

(Swami Vireswarananda)
General Secretary

সূচীপত্র

১

রচনা	রচয়িতা	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী	স্বামী মাধবানন্দ	১
স্বামীজীর ভারত	স্বামী গম্ভীরানন্দ	৪
স্বামী বিবেকানন্দ ও নববেদান্ত	স্বামী বেদান্তানন্দ	৬
অনাগত বিধাতা (কবিতা)	স্বামী অমৃতত্বানন্দ	১১
বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যতের আশা	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
আমেরিকায় স্বামীজীর ধর্ম-প্রচার	স্বামী নির্বেদানন্দ	১৭
বিবেকানন্দের কবিতা : তার রূপ ও স্বরূপ	শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	২১
মহাজীবন (কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু	২৩
শিবপূজা	স্বামী দিব্যাত্মানন্দ	২৫
স্বামী বিবেকানন্দ ও সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচেতনা	শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ	২৯
স্বামীজীর আশা	শ্রীবীরেশ্বর দাস	৩৪
ভারতপুরুষ (কবিতা)	শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু	৩৯
স্বামীজী-প্রসঙ্গ ও ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি	শ্রীফণিভূষণ বসু	৪১
'আমি অশরীরী বাণী'	ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ	৪৫
বিবেক-বাণী (কবিতা)	শ্রীবিমল দত্ত	৪৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার নবজাগরণ	শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার	৫০
স্বামিনো বিবেকানন্দস্য প্রেমধর্মঃ	শ্রীদিলীপকুমারমালিকস্য	৫৫
সংঘবদ্ধ অন্ধকার ও বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীরাখাল বর্মণ	৫৭
সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীরাধাশ্যাম দাস	৫৮
নব ভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
বিবেকানন্দ সম্পর্কিত কয়েকটি অনুবন্ধ (কবিতা)	সামসুল হক	৬৬
স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ	শ্রীফণীন্দ্রকুমার দেব সরকার	৬৭
ভারত-ভাস্কর বিবেকানন্দ	শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু	৬৯
স্মরণিকা	ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ কর্তৃক সংকলিত	৭৮
যুগাচার্য প্রসঙ্গে যুগ-মনীষী	...	৮৩
বহ্নি-বাণী	...	৯১
স্বামীজী প্রসঙ্গে গুরুভ্রাতাগণ	...	৯৮
বিবেক-স্মৃতি	স্বামী ওঙ্কারানন্দ	১০০
গীতি-অর্ঘ্য	স্বামী গর্গানন্দ	১০২

Inaugural Address	Swami Madhavananda	105
Vivekananda and Nivedita	Kedarnath Chatterji	110
Swami Vivekananda and the Philosophy of our Nation	Swami Chidatmananda	114
Some Views on Education	Swami Vireswarananda	119
Swamiji in the Contemporary American Press	...	125
Swamiji in the Contemporary English Press	...	130
Swamiji in the Eyes of the West	...	131

LIBRARY
No. ....
...ayee Ashram
BANARES

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং তস্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া।
বিবেকবৈরাগ্যবিশুদ্ধচিত্তং যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি॥

বিবেকজানন্দনিমগ্নচিত্তং বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবেকিনং তং সততং নমামি॥

ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়ৎ যৎ নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং স্বরূপং প্রকরোতি যস্য আনন্দমূর্তিং তমহং নমামি॥

সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি॥

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং বিবেক-আনন্দমহং নমামি॥

—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

LIBRARY
No. 11/290
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।"

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী

11|290

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আমার সহৃদয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। তাঁহার পার্থিব কর্মজীবন স্বল্পকালব্যাপী হইলেও উহা যুগপ্রবর্তনকারী আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল এবং ঐ অল্প সময়ে ঐ অনুভূতি প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমভাবে ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইয়াছিল।

সকল দেশের সকল যুগের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা-স্বরূপ তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে তিনি মানুষের মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়া বিশ্বব্যাপী উদারভাব লাভ করেন। যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর, এবং তাঁহার উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ দাবী করিতে পারে না। নরনারীকে তাহাদের দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা—মানবজাতির ঐক্য সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্য। একমাত্র এই ভাবের দ্বারাই হিংসাদ্বন্দ্ব-জর্জরিত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

তাঁহার নিজের ভাষায়: 'ভারতকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি, কিন্তু দিন দিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, আমার কাছে ভারতই বা কি, ইংলণ্ড আমেরিকাই বা কি? আমরা সেই ঈশ্বরের দাস, অজ্ঞতাবশতঃ লোকে যাহাকেই 'মানুষ' বলিয়া মনে করে।

'সামাজিক, রাজনীতিক, আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ কল্যাণের একটি মাত্র ভিত্তি, এইটুকু জানা, যে আমি ও আমার ভ্রাতা একই। সকল দেশের সকল মানুষের পক্ষে এ-কথা সত্য।'

তাঁহার বহুব্যাপক বাণীর মধ্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম, যুক্তি ও বিশ্বাস, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক, আধুনিক ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত হইয়াছে; তিনি ছিলেন সেই মিলনের মূর্তবিগ্রহ। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্তনের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তাঁহার জীবন ও বাণী সেই শক্তির সঞ্চার করিয়াছে।

তূর্যনিনাদে তিনি তাঁহার দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন: 'কাজ কর, কাজ কর, কর্মের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।' তুচ্ছ ঈর্ষা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার—'বহুত্বে একত্ব'-রূপ আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হইতে বলিয়াছেন। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া ভারতের বিবিধ ও ভিন্নমুখী জাতি, ভাষা ও রীতিনীতির মধ্য হইতে একটি মহাজাতি গড়িয়া তুলিতে তিনি দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন; এই প্রক্রিয়ার গতি যদিও মন্থর, তথাপি ইহার ফল দীর্ঘস্থায়ী; দ্রুত ও

চমকপ্রদ ফলপ্রাপ্তির আশায় বলপ্রয়োগ হইতে তাহারা যেন বিরত থাকে, ঐরূপ কার্যের ফল অল্পকালস্থায়ী। তিনি বলিয়াছেন, কিছুই ধ্বংস না করিয়া বহুকে একত্বে সংহত কর ; ঐরূপ ধ্বংসক্রিয়া জাতিকে দুর্বল করিবে, দীন দরিদ্র করিবে।

তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিতেন, অতীতে অর্জিত এই জাতির সম্পদের দিকে সগর্বে তাকাও এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ মহিমায় বিশ্বাসী হও। তিনি বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে যত গর্বিত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম ; গর্ব আমার নিজের জন্য নয়, আমার পূর্বপুরুষদের জন্য। এই গর্ব আমাকে শক্তি দিয়াছে, পথের ধূলি হইতে আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। তোমাদেরও মধ্যে এই গর্ব সঞ্চারিত হউক !'

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : 'বিধাতৃনির্দিষ্ট তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ করিবার জন্য ঐ আমার মাতৃভূমি রানীর মত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন ; পৃথিবীতে কোন শক্তির সাধ্য নাই, তাঁহার গতি রোধ করে।'

'ওঠ, ওঠ, দীর্ঘ রজনী ঐ কাটিয়া যায় ! প্রভাত হইতেছে, তরঙ্গ উঠিয়াছে, কোন কিছুই এ বন্যার দুর্বার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।' 'মা আর ঘুমাইবেন না। বাহিরের কোন শক্তি আর তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না, প্রচণ্ড শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় পদভরে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন।'

দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন—তাহারা যেন নিজেদের উপর বিশ্বাসী হয়, আলস্য পরিত্যাগ করে, এবং ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। তিনি বলিতেন : 'আত্মবিশ্বাসী হও, অন্যথা কোন মুক্তি সম্ভব নয় ! বিশ্বাসী হও, শক্ত সবল হও,—একমাত্র ইহাই আমাদের প্রয়োজন।' 'নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান কর, দেখ—কিভাবে উহা জাগিয়া উঠে ! শক্তি আসিবে, গৌরব আসিবে, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই আসিবে।' 'ত্যাগ বিনা কোন মহৎ কাজ হয় না···আরাম, সুখ, নাম-যশ, পদ-মর্যাদা—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দাও।' 'আজ আমাদের দেশের প্রয়োজন—লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতসদৃশ স্নায়ু এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যাহা যে কোন উপায়ে হউক, কার্য সিদ্ধ করিবেই ; এজন্য যদি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়—তাহাতেও প্রস্তুত !' 'হে বীর, সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই···ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ! আর বলো দিনরাত : হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমায় মানুষ কর !'

এই বল, বিশ্বাস, শক্তি ও সংহতির বাণীই আমাদের বর্তমান সঙ্কটে বিশেষ প্রয়োজন।

এই শতবার্ষিকী-বৎসরে স্বামীজীর চিন্তা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে, এবং মানুষের গঠনমূলক আধ্যাত্মিক শিক্ষার চিরন্তন উৎস হইয়া থাকিবে। এগুলি হইতে মানুষ লাভ করিবে এক দিব্য দৃষ্টি, আরও লাভ করিবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে একত্ব, সমন্বয় ও সহযোগিতা আনয়ন করিবার সঙ্কল্প।

স্বামীজীর যে বিরাট ভাব ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মিলিত করিয়াছিল, সেই ভাব আমাদিকে অনুপ্রাণিত করুক ; 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য—এই জীবনপ্রদ নীতির আলোকে আমরাও যেন ঐ উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী কার্য করিতে পারি।

বেলুড়মঠ,
১৭ই জানুআরি, ১৯৬৩

স্বামী মাধবানন্দ

LIBRARY
No. 11/290
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

স্বামীজীর ভারত

স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামীজীর ভারত শুধু "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি" কিংবা "স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" নয়। উহা এক জীবন্ত দেবী। তাঁহার পশ্চাতে আছে যেমন গরিমার ঐতিহ্য, তেমনি সম্মুখে আছে ভাস্বর ভবিষ্যৎ। বর্তমান দুর্দিনের মধ্যেও মায়ের স্বরূপ তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতমাতা অজর, অমর; মা আমাদের অনন্তশক্তির উৎস; অপূর্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃতে তাঁহার সর্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল। ভারত পুণ্যভূমি; মুক্তিকামী মানুষমাত্রকে এখানে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ভারত ধর্ম ও দর্শনের উৎস; কত শিল্পকলাও এখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াছে! এক কথায় মানবসভ্যতার আদিভূমি এই ভারতবর্ষ হইতে "আধ্যাত্মিকতা, নীতিজ্ঞান, মধুরতা, কোমলতা, ও মানবপ্রীতির" ভাবধারা জগতের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে—নীরবে অজ্ঞাতসারে; অথচ সেই অদৃশ্য শক্তিই মানবসংস্কৃতিকে উদ্বোধিত করিয়াছে, ঠিক যেমন নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিপতিত শিশিরকণা বনরাজিকে ফলপুষ্প-কিশলয়ে সুসজ্জিত করে। "সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবতরঙ্গের পর ভাবতরঙ্গ ভারত হইতে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাদ লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।" আর "শুধু ধর্মবিষয়ে নয়, শিল্পকলায়ও ভারতই সমগ্র জগতের আদিগুরু।"

ভারতের পরাধীনতার দিনে রচিত ইতিহাস বলিত, ভারত চিরকাল নির্বীর্য, কর্মবিমুখ ও পরাধীন হইয়া থাকারই উপযুক্ত। কিন্তু স্বামীজী সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলেন, ভারতমাতা কত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ছিলেন। এখনও কত মহারত্ন তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত, এবং ভবিষ্যতে তিনি মানবসমাজকে কিরূপ সম্পদে ভূষিত করিতে সক্ষম; প্রাচীন জগৎ ভারতের নিকট ঋণী ছিল; বর্তমান জগতেরও রক্ষাকবচ ভারতেরই রত্নকোষে সুরক্ষিত এবং জগৎও তাহার জন্য লালায়িত। "এক্ষণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে; আর ভারতকে জগতে সকল জাতির জন্য ইহা যোগাইতে হইবে।" স্বামীজী তাঁহার স্বদেশকে ভিক্ষুর বেশে দেখিতে চাহেন নাই; তিনি তাহাকে বসাইতে চাহিয়াছিলেন দাতার আসনে।

শাস্ত্রে বলিয়াছে, ভগবান্ সর্বব্যাপী; তাঁহাকে আমরা পাই বিচিত্র রূপে, বিভিন্ন কালে, বিবিধ দ্রব্য ও পরিবেশের মধ্যে। সেই বিরাট্ ব্রহ্মের দর্শন পাইলেন স্বামীজী দেশমাতৃকার দেহে। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি। সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।" এ যেন ঠিক বেদবাক্যের প্রতিধ্বনি—

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

কাজেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের অর্থ দেশমাতৃকার পূজা বা নারায়ণজ্ঞানে স্বজাতির সেবা। স্বামীজী দেশপ্রেমিক হইলেও সে প্রেম ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। তিনি ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতের কথা ভাবিতে পারিতেন না; আর বলিতেন, ভারত যেদিন ধর্মহীন হইবে, সেদিন ভারতের অস্তিত্ব লোপ হইবে। দেশপ্রেমের দিক হইতে স্বামীজী যেমন অতুলনীয়, ধর্মের দিক হইতেও তেমনি তিনি অনুপম। ধর্ম ও দেশপ্রেমের তিনি এক অপূর্ব সমন্বয়মূর্তি।

আবার তাঁহার স্বদেশপ্রেমে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ভারতকে ভালবাসিতে হইলে অপরকে ঘৃণা করিতে হইবে —এমন কোন কথা নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের অবনতি সেদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, যেদিন ভারত ম্লেচ্ছ-শব্দ আবিষ্কার করিয়া বিদেশের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিয়াছিল। আর স্বীয় বিশ্বপ্রেমের নিদর্শনরূপে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কোন দেশের ক্রীতদাস নাকি! আমি সারা বিশ্বের।" বস্তুতঃ স্বামীজীর মতে ভারতকে বাঁচিতে হইলে সারা বিশ্বের সহিত ভাব ও কৃষ্টি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির আদান-প্রদান অব্যাহত রাখিতে হইবে। অথচ সর্বক্ষেত্রে ভারতকে নিজস্ব সত্তা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। ধর্মই হইল ভারতের সেই বিশেষত্ব; আন্তর্জাতিক মিলনের ক্ষেত্রেও ধর্মই হইবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্য।

আবার ভারতের নিজস্ব ভূমিতেও ধর্মই প্রধান স্থান অধিকার করিবে; কারণ বস্তুতঃ এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই ভারতবাসী এই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। এই কালমধ্যে কত সভ্যতার উত্থান-পতন হইল; কিন্তু ভারতের মূল ভাবধারা আজও অটুট রহিয়াছে।

এই ধর্মই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। ইংরেজের আমলের পূর্বে হয়তো আসমুদ্র-হিমাচলের একচ্ছত্র সম্রাট কোনকালে কেহ ছিলেন না; কিন্তু তখনও আমরা ছিলাম "ভারতবাসী" এবং তখনও আমরা "মহাভারত" রচনা করিয়াছিলাম শুধু এই ধর্মের শক্তিতে। এখনও আমরা পূজাকালে মন্ত্রোচ্চারণ করি "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে সিন্ধু কাবেরি" ইত্যাদি। আমাদের তীর্থস্থল সারা ভারতে অবস্থিত। আমাদের সর্বমান্য ধর্মনেতারা ভারতের সর্বত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী সর্বত্র সম্মানিতা। আমাদের দেবভাষা সংস্কৃত এখনও সকলের শ্রদ্ধার্হ।

স্বামীজী ধর্মের ভিতর দিয়া ভারতের পরিচয় পাইয়াছেন এবং ধর্মজননীরূপেই তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়াছেন। ধর্মকে বাদ দিয়া যে রাজনীতি বা সমাজসংস্কারাদি তাহা কোনকালেই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও আধুনিক-কালে আমরা ধর্মকেই দেশের সর্বপ্রকার অবনতির জন্য দায়ী করিয়া থাকি, তথাপি স্বামীজীকেই জন-জাগরণের সর্বোত্তম নেতা বলিয়াও স্বীকার করি। ফলতঃ আমরা স্বামীজীকে ও তাঁহার দেশপ্রেমকে এযাবৎ একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া আসিয়াছি। পরপদানত জাতি চাহিয়াছিল এমন একজন নেতা যিনি স্বাধীনতা আনিয়া দিবেন। স্বামীজীর বিঘোষিত শক্তিময় স্বাধীনতার মন্ত্র আমাদের হৃদয়ে উৎসাহ জাগাইয়া ভারতের পরাধীনতা খণ্ডন করিয়াছিল। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য-লাভের পরও স্বামীজীর কাজ সম্পূর্ণ হইয়া যায় নাই; বরং এখন তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। স্বামীজী আসিয়াছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়িতে। রাজনীতিক স্বাধীনতালাভের পর এখন মানুষ-গড়ার দিন আসিয়াছে; কারণ প্রকৃত মানুষ না হইলে আমরা আমাদের কষ্টোপার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব না। অর্জিত সম্পদের সুরক্ষার জন্য আজ স্বামীজীর বাণী আবার নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের সেই আশা দিয়া হৃদয় পূর্ণ করিতে হইবে, যাহা স্বামীজী ঋষিদৃষ্টিতে দেখিয়া আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস—ভারত কোন কালে যাহা ছিল না, শীঘ্রই সেই শ্রেষ্ঠতার অধিকারী হইবে।...আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি—আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হইয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণী প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও নববেদান্ত

স্বামী বেদান্তানন্দ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত। তাঁহার লীলাবসানের কাল প্রায় সমুপস্থিত। যে মহতী বাণী প্রচারের জন্য তাঁহার শরীরগ্রহণ, সেই প্রচারকার্য যাহাতে তাঁহার তিরোধানের পর অব্যাহত-গতিতে চলে, সেই উদ্দেশ্যে একদল শিক্ষিত ত্যাগী উৎসাহী যুবককে তিনি একত্র করিয়া তাহাদিগকে নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতেছেন। এই যুবকদলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার সবচেয়ে বেশি ভরসা। তাহাকেই চান তিনি দলপতি করিয়া তাঁহার আদর্শের ধারক ও বাহক একটি সংঘ গড়িয়া তুলিতে। কিন্তু তখন নরেন্দ্রনাথের মন ব্রহ্মানুভূতির সাগরে মগ্ন হইয়া থাকার জন্য ব্যাকুল। একদিন তিনি গুরুদেবকে ধরিয়া বসিলেন, "সকলের কত কিছু অনুভূতি হচ্চে, আমার কিছু করে দিন।"

"তুই কী চাস?"

"আমি চাই, অমনি তিন চারদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। মাঝে মাঝে একবার খেতে উঠব।"

"তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! আমি আশা করে আছি, তুই বিশাল বটগাছের মতো হয়ে কত তাপিত প্রাণীকে তোর শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিবি। তা নয়, তুই নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চাস্। তুই তো গান গাস্, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়'।"

দিনের পর দিন চলিল গুরুকর্তৃক পথনির্দেশ, আর শিষ্যের প্রস্তুতি। কত দিন রাত্রে একা নরেন্দ্রকে নিজের কাছে ডাকেন, কত উপদেশ দেন। ত্যাগী শিষ্যদের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন নরেন্দ্রনাথের উপর। একদিন এক টুকরা কাগজে কি লিখে নরেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। কাগজে লেখা ছিল, 'নরেন শিক্ষা দেবে।' নরেন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "আমি পারব না।"

কিন্তু পারিব না বলিলেই কী চলে? এ যে যুগনায়কের অমোঘ নির্দেশ—সেই চাপরাস, যে চাপরাস না থাকিলে লোকে কথা শোনে না, যে চাপরাস থাকিলে সামান্য ব্যক্তিও অসীম শক্তির অধিকারী হয়,—তিনি গল্পচ্ছলে কতবার তাঁহার ভক্তগণকে শুনাইয়াছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরলীলা সংবরণ করিলেন। তখন হইতে শ্রীগুরুর আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়িল নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা হইল গুরুভাইদিগকে সংঘবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণ একে একে সেখানে সমবেত হইয়া কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ হইলেন তাঁহাদের নেতা। গুরুকৃপায় তাঁহারা অন্তঃসন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কাশীপুরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের এগার জনকে গৈরিক বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষমালা প্রদান করিয়া ভিক্ষাও করাইয়াছিলেন। এখন এক শুভ দিনে শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষা করিয়া বিরজা হোম সমাপনান্তে বাহ্য সন্ন্যাস এবং উহার চিহ্ন গৈরিক বস্ত্র ধারণ এবং আশ্রমোচিত নাম গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

গুরুভ্রাতৃগণকে মঠে সংঘবদ্ধ করার পর স্বামীজীর প্রাণে তীর্থভ্রমণের এবং নির্জনে একাকী কঠোর তপশ্চরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। প্রথমবারে উত্তর ভারতের কয়েকটি তীর্থদর্শনান্তর বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয়বার ঘুরিতে ঘুরিতে হিমালয়ের হৃষীকেশে উপনীত হইলেন। আকাঙ্ক্ষা—কোন নির্জন স্থানে বাস করিয়া ব্রহ্মানুভূতির সুখ অনুভব করিবেন। কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতা বাদ সাধিলেন—হিমালয়বাস হইল না, তাঁহাকে বরাহনগরে ফিরিতে হইল। তৃতীয় বার

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আবার চলিলেন হিমালয়ে আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিবার স্থির সংকল্প লইয়া। কাশীপুরে নির্বিকল্প সমাধির যে আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার প্রাণের আকুতি—ব্রহ্মের সেই নির্গুণ নির্বিশেষ চিৎ-বিভাবের মধ্যে আত্মনিমজ্জন। কিন্তু যিনি স্বীয় ধর্মসংস্থাপনরূপ আরব্ধ কর্ম নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া লীলাসংবরণ করিয়াছেন—তিনি তো বলিয়াই গিয়াছেন—ব্রহ্মানুভূতির সেই বিভাবে নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ-পথ তিনি আপাততঃ চাবিবন্ধ রাখিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম তো কেবল বাক্যমনের অতীত চিৎসত্তা মাত্র নন—তিনিই আবার আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দ হইতে এই জীবজগতের উদ্ভব, যে আনন্দ লইয়া সকল প্রাণী মাতিয়া আছে, আবার যে আনন্দে সকলের চরম গতি। প্রভুর কৃপায় নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সেই আনন্দস্বরূপের স্ফূর্তি নিত্য অব্যাহত রহিল। সকল প্রাণীর সকল চেষ্টার মধ্যে তিনি সেই প্রেমময়ের বিচিত্র লীলার প্রকাশ দেখিতে লাগিলেন। অনুভব করিতে লাগিলেন—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়'; আর 'পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ; দস্যু হরে, প্রেমের প্রেরণ!"

সেই প্রেমের প্রেরণা তাঁহাকে হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে আত্মানন্দে বিভোর থাকিতে দিল না—তাঁহাকে টানিয়া নামাইল সমতলভূমিতে ধূলিমলিন সাধারণ মানুষের মাঝে। এবার তাঁহার যাত্রা সুরু হইল পশ্চিম ও দক্ষিণ অভিমুখে। যে শিক্ষাদানের দায় তিনি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন সেই শিক্ষা যাহাকে দিবেন তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন যে প্রথমে। সমগ্র মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত পর্যটন করিয়া নীলাম্বুবিধৌত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে মা কন্যাকুমারীর মন্দিরে তিনি উপনীত হইলেন। এই পরিভ্রমণকালে তিনি দীন হীন পতিত অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত মিশিলেন; আবার মিশিলেন কত রাজারাজড়া, গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কত তীর্থ মঠ মন্দির পুরাকীর্তি ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিলেন। সমগ্র ভারত ভ্রমণের ফলে গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের কোন্ রূপ তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল? তিনি দেখিলেন,—"ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে।" "হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে··· পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মুকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক" খেয়ে শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে—সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" আর "ভারতবর্ষে গরীবদের সামান্য লোকদের পতিতদের···কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র ভারতের পতিত ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক তাহার উঠিবার কোন উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে; কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।"

কোন্ সুদূর অতীতে সভ্যতার প্রথম প্রভাবে যে পুণ্যভূমিতে মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছিল সেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন পতিত অবজ্ঞাত মানবের মর্মভেদী হাহাকার তাঁহার হৃদয়কে দলিত মথিত করিয়া তুলিল। এই আশাহীন উৎসাহহীন অগণিত নরনারী, বর্তমান যাহাদের দুঃখময় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তাহাদের মধ্যে সনাতন ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন কীরূপে সম্ভব হইবে? আলোক পাইবার আশায় তিনি ভারতভূমির শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার জীবনদেবতা অচিরে তাঁহাকে পথের ইঙ্গিত দিলেন। স্বামীজির লোকশিক্ষাদানের প্রস্তুতিপর্ব এইখানে সমাপ্ত হইল।

স্বামীজি অনুভব করিলেন, "সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।···তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।" "ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই—কেবল

তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।...পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে; পরিণামে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতের কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে।"

জাতির লুপ্ত মানবতাবোধকে উদ্বুদ্ধ করিবার যে অব্যর্থ উপায় তিনি নির্ধারণ করিলেন তাহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য চাই—মানুষ আর টাকা। তাঁহার আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া দেশের একদল যুবক নরনারায়ণ-সেবার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? রাজা মহারাজা প্রতিপত্তি-শালী ধনী মানী ব্যক্তিদের নিকট তাঁহার প্রাণের বেদনা জানাইলেন; কেহই কর্ণপাত করিল না। আর "দেউলিয়া গভর্নমেণ্ট কোন সহায়তা করিবে না, করিতে সক্ষমও নহে।" কিন্তু স্বামীজী নিরাশ হইলেন না; সংকল্প করিলেন, নিজেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

অচিরে সুযোগও উপস্থিত হইল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের আয়োজন চলিতেছিল। স্বামীজীর অনুরাগী একদল যুবক তাঁহাকে এই সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন শুধু হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নয়; মুখ্যতঃ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির উপায় অন্বেষণ করিতে। তিনি আমেরিকাবাসী-দিগকে হিন্দুধর্মের সার্বভৌম মহৎ তত্ত্বসমূহের উপদেশ দিবেন; বিনিময়ে যে অর্থ পাইবেন তাহার দ্বারা তাঁহার পরিকল্পিত গণজাগরণমূলক কার্য আরম্ভ করিবেন, ইহাই হইল তাঁহার সংকল্প। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সম্পদপ্রাপ্তির ফলে কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাদানে ভারতের ঐহিক উন্নতিবিধানে সহায়তা করিবেন, এ আশা তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সে সকলের সমবায়ে এক নবীন মানবসমাজ গঠনের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক যুবক বিবেকানন্দ যাত্রা করিলেন অপরিচিত বিধর্মীদের মধ্যে তাঁহার নববেদান্তের বার্তা প্রচার করিতে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বামীজী আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শিকাগো সহরে উপনীত হইলেন। ধর্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশনের তখনও প্রায় দুই মাস বাকি। তিনি এই সময়টা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি, নারীজাতির অবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই শুভদিনে শিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্বোধন হয়; এই সম্মেলনে সনাতন বৈদিক ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যাদ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ পতিত পরপদানত ভারতের প্রতি জগদ্বাসীর সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, এই মহাসভায় তিনি সর্বধর্মসমন্বয়, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ায় পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া অসংখ্য বক্তৃতার মাধ্যমে সনাতন ধর্মের সারতত্ত্ব ও ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রচার করিয়া বেড়াইলেন; স্থানে স্থানে অধিকারী নরনারীগণের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে মনোনিবেশ করিলেন; এই সময়ের মধ্যে দুইবার ইংল্যাণ্ডে গমন করিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন।

এই অবিশ্রাম কর্মের মধ্যে স্বামীজীর মন সর্বদা পড়িয়া ছিল ভারতভূমির উপর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকুশলতা এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা এই উভয়ের সমবায়ে ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন ছিল তাঁহার লক্ষ্য; আর লক্ষ্য-

সিদ্ধির উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাই আমেরিকা-যাত্রা-পথে জাহাজ হইতেই তিনি তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগী যুবকবৃন্দের এবং গুরুভ্রাতাদের সহিত পত্রের মাধ্যমে তাঁহার ভারতীয় কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য গুরুভাইগণের উপর তাঁহার বিশেষ আশা; তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ভারতে ও জগতে প্রচারের জন্য এক নবীন সংঘ গড়িয়া তুলিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রাচীন পন্থার অনুসরণকারী; বৈষয়িক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া সাধন ভজন তপস্যা সহায়ে মুক্তির আনন্দ অনুভবই তাঁহাদের কাম্য। এই গুরুভাই-দিগকে জগতের হিতকর কর্মে আত্মনিয়োগের জন্য সংঘবদ্ধ করিতে তাঁহাকে কী বিপুল প্রয়াসই না করিতে হইয়াছে! অসংখ্য পত্রে স্বামীজী নিজের মতবাদ ব্যাখ্যা করিলেন। নববেদান্তবাদের ব্যাখ্যান, উৎসাহ উদ্দীপনা, অনুরোধ উপরোধ, ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র কষাঘাত প্রভৃতি বিচিত্রভাবে পূর্ণ স্বামীজির পত্রসমূহ জগতের পত্রসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্; সে সকল যে কেবল তাঁহার সমকালীন অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ, শিষ্যবৃন্দ এবং গুরুভ্রাতৃগণকে প্রেরণাদান করিয়াছে এবং সংঘবদ্ধ হইতে সহায়তা করিয়াছে তাহা নয়; পরবর্তীকালে দেশসেবাব্রতে আত্মোৎসর্গকারী স্বদেশ-প্রেমিক যুবকবৃন্দেরও প্রেরণার উৎসরূপে ক্রিয়া করিয়াছে।

আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে বেদান্তপ্রচারে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও স্বামীজী ভারতভূমির দুঃখদৈন্যের কথা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যখন যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তিনি তাঁহার বিদেশী শিষ্য ও অনুরাগী বন্ধুগণকে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া ভারতের জনসাধারণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল—"আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয় তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয় তাহা গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে।" স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়া কয়েক জন বিদেশী শিষ্য ও ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ভারতে আগমন করিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রদত্ত অর্থে বেলুড় মঠের ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল। মিস মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) ভারতবাসীর সেবায় বিশেষভাবে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আত্মোৎসর্গ করিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমগ্র ভারতভূমি তাঁহার অভ্যর্থনায় মুখর হইয়া উঠিল। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তিনি দেশবাসীকে তাঁহার নববেদান্তের ব্যাখ্যা শুনাইলেন; সনাতন ধর্মের মূল আদর্শসমূহ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে গ্রহণ করিতে এবং জনসাধারণের সেবায় কর্মতৎপর হইতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিনি শিষ্য ও গুরুভ্রাতৃগণকে লইয়া সংঘগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল সত্য নিজের জীবনে অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়াছিলেন সেই সকল প্রচার এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঐ সকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত করিতে সর্বসাধারণকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার মূলমন্ত্র হইল—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তিসাধন এবং জগতের হিত। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যগণকেও তাঁহার প্রস্তাবিত গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করিলেন। মাদ্রাজে ও ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচারের জন্য সন্ন্যাসিগণ প্রেরিত হইতে লাগিলেন।

"আমি এমন একটা চক্র প্রবর্তন করিব যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তার পর, নরই হউক আর নারীই হউক—তাহারা নিজেরাই স্বীয় অদৃষ্ট রচনা করিবে।' ইহাই ছিল স্বামীজীর জীবনের "একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।" আমেরিকায় প্রচারকার্যের প্রারম্ভেই তিনি এই নবযুগচক্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর আড়াই বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে উহা সুগঠিত এবং উহাতে গতিবেগ সঞ্চারিত করিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আবার

আমেরিকায় চলিলেন মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে শিক্ষাদানের জন্য তিনি গুরুকর্তৃক আদিষ্ট সে কাজের তো তখনও সমাপ্তি হয় নাই—তাই শিক্ষাদানও অব্যাহত-ভাবে চলিল। দেড় বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার পর আর দেড় বৎসর স্বামীজী নরদেহে বর্তমান ছিলেন। কঠিন পীড়ায় এই সময় তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইতে থাকিলেও একদিনের জন্যও তাঁহার শিক্ষাদান-কার্যের বিরাম ছিল না। শুধু মঠবাসী গুরুভাই ও শিষ্যগণের সঙ্গে নয়, পরন্তু, কলিকাতা এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অসংখ্য ব্যক্তির সহিত, ধর্ম দর্শন সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি কত বিচিত্র বিষয়েরই আলোচনা তাঁহাকে করিতে হইত। আর এই সকল উপদেশ সকল আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রবর্তিত নবযুগ-ধর্মের বিস্তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীকে দিয়া 'মায়ের কাজ' যতটুকু করাইবার করাইয়া লইলেন। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই সমাগত হইল। মহাপ্রয়াণের পুণ্য দিবস—কিন্তু এদিনও স্বামীজীর শিক্ষাদানের বিরাম নাই। বেলা একটা হইতে তিন ঘণ্টাকাল মঠের ব্রহ্মচারীদিগকে ব্যাকরণ পড়াইলেন ও পরে স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। এই দিনই রাত্রে জগজ্জয়ী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ মহা-সমাধিযোগে মর-লীলা সংবরণ করিলেন। নির্বিশেষ-অদ্বয়-ব্রহ্মানুভূতির প্রবেশপথের চাবি শ্রীশ্রীঠাকুর খুলিয়া দিলেন। স্বামীজী আপাতঃ দৃষ্টিতে হইলেন দায়মুক্ত; কিন্তু এখনও তাঁহার কাজের বিরাম নাই! তাঁহার অমর শিক্ষা-বাণী আজিও যুগ হইতে যুগে ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের গূঢ় সমন্বয়ে বিরাট যজ্ঞকাণ্ডের যে দায়ভাগ তিনি আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহার জন্ম-শতাব্দীকালে তাহার গুরুত্ব যদি আমরা যথাযথ অনুভব করিতে পারি তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের সকল শ্রদ্ধার্ঘ্য সার্থকভাবে নিবেদিত হইবে, সন্দেহ নাই।

বহ্নি-বাণী

ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ-তুল্য হইয়া যায়—ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা।……ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। তুমি যদিও দুর্ব্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো করিও না।

LIBRARY
No. 11/290
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অনাগত বিধাতা

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

তোমাদের চরণে কোটি প্রণাম
এ ভুবনে—এ প্রাণ, অনন্য অবদান ;
তোমাদের চরণে প্রণাম।

মানবের জয়গান গেয়ে
যারা ভুলেছে তোমাদের ;
বস্তু-যাগের হব্য করেছে যারা,
মানুষেরে—
মানুষের অলোক-সত্তারে না করি স্বীকার
দুটি মুষ্টি অন্ন তুলে ক্ষুধা-খিন্ন মুখের 'পরে ধরে
যারা কেড়েছে মুক্তির পরম আনন্দ,
স্বাধীন ভাবনারে করেছে হরণ,
তাহাদের বলোদ্ধত কঠিন হস্তের
তলে তলে জমেছে যে নর-রূপী নারায়ণের
ক্ষুব্ধ অভিশাপ !

দিকে দিকে দানবের এই অভ্যুত্থান,
মানব-দেবের স্বর্গরাজ্য করিছে কলুষ
'অমৃতের সন্তানে'র করি অসম্মান।
মানব আর দানবে মিলে আরবার
বিশ্বেরে করিয়া মন্থন—উঠিয়াছে যে হলাহল,
কোন নীলকণ্ঠ তা করিয়া ধারণ
পৃথিবীরে ফিরে দিলে অমরত্ব—
'অমৃতের সন্তান' বলি মানবেরে দিলে ডাক—?
ধীরে ধীরে মিলিতেছে কাল সমুদ্রতীরে—
কোটি কোটি মানবের ক্ষুব্ধ অন্তর
কামনা করিছে অশ্রুত বাণীতে
অসুর-নিধন ?

জনতার মধ্য হতে জাগিবে ভগবান্
আগামী সে মুক্তি-বিধাতা রহিয়াছে
ছদ্মবেশে তব বাণীরূপে মানবের মাঝে
তাঁর তরে রহিল মোর অনন্ত প্রণাম।

বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যতের আশা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো-আঁধারের মাঝখান দিয়ে উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিত একটি মঙ্গল-কামনা আমরা পেয়েছি আমাদের প্রাচীনদের কাছ থেকে—জীবেম শারদং শতং। কুশল-কর্ম করো, জ্ঞানে মনে ধ্যানে নিদিধ্যাসনে সংযত হও, সংহত হও, একশো বছর বেঁচে থাকো—বৈদিক ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে এই সুর, এই আশীর্বাণী। মানুষের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে একশো বছর হয়তো দীর্ঘকাল, কিন্তু একটা জাতির পরিক্রমায় এটা শুধু একটা পরিমাপ। তাই যেখানে এমন মানুষ জন্মায় যে হয় সব পথিক মানুষের প্রতীক্ তারই শতবার্ষিকী করি আমরা, বলি—জয়তু, ঐ মহামানব আসে। ঢাকঢোল কাড়ানাকাড়া বাজে, দেশ-বিদেশে পথে-প্রান্তরে, সভায় সমিতিতে কতো হৈ-হুল্লোড় হয়, অমায়িক বক্তৃতা হয় মাইকে, সারগর্ভ ভাষণ, বিদগ্ধ আলোচনা, গুণীজ্ঞানীরা স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, প্রশস্তির ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু সবই হয়তো বা এহ বাহ্য। তাই যাঁদের কর্তার ভূত নাড়েও না ছাড়েও না, তাঁরা নিভৃতে রাত্রির স্তিমিত অন্ধকারে চুপিচুপি প্রশ্ন করেন—কী পেলাম, কী দিলাম— শুধু ভাবগদ্গদ রোমন্থন,—গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা, ইনিয়ে বিনিয়ে ভাষার বিন্যাস, উচ্ছ্বাস আবেদন নিবেদন, না, চোখের জলে ভিজিয়ে :

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহ গাওত গীত
ঝলকত ও মুখচন্দ।

ভাবি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক আকাশে এই যে এত বড় একটা দীপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য তাপ দিলে, আলো দিলে, অনির্বাণ আশা নিয়ে এলো, অমেয় প্রেমের দ্বার খুলে দিলে, তার সম্যক্ অনুধ্যান কই? স্বামীজির রুচি, তাঁর ধ্যান, তাঁর অনুভূতি, তাঁর কর্মৈষণা, তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গী, তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে কতটুকু পাঠ আমরা নিলাম, সাধারণ জাতীয় মানসকে সেই প্রজ্ঞা, সেই নিষ্ঠা, সেই জীব শিব সেবার চেতনা, সেই বেদনাবোধ কতটুকু এগিয়ে দিলে। প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যেই আছে বহু সাধকের সাধনার ধারা। অনেকেই বলে থাকেন যে যাঁরা লোকোত্তর মনীষী তাঁদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনা-সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কী অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় স্বামীজীর প্রতিভা।

আমার তরুণ বয়সে বিবেকানন্দ বলতে আমার মনে পর পর দুটি ছবি জেগে উঠতো, একথা আমি অনেকবার বলেছি, কিন্তু বারে বারে বলেও মন তৃপ্ত হয় না। একটি হচ্চে দণ্ড হাতে পরিব্রাজক চলেছেন দেশে-বিদেশে, জগজ্জয়ী চেতনা নিয়ে ফুটে উঠেছে একটা দৃপ্ত ভঙ্গী, আর একটি ছবি যেন মৌন সমাসীন এক ধ্যানী বুদ্ধ, আপনি মগ্ন। দেখছি তাঁকে কুমারিকায় তিন রুদ্রসমুদ্রের বাহুঘেরা অর্ধ-মগ্ন শৈলে বসে ভারতবর্ষের ধ্যান করতে, যে ভারত ফুটে বেরুবে ভুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে-মজুর-মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাঙীর ঘর থেকে। দেখেছি তাঁকে চলেছেন হিমগিরির তুষারমৌলীর শীর্ষে অমর আত্মার সন্ধানে, ভবানীর দুয়ারে অমৃত ক্ষীর খেতে—মায়ের কোলে মায়ের ছেলে—ওরে আমি আমি করিসনি, কে কাকে রাখে, কে কাকে দেখে—বিশ্বের প্রতিটি অণুতে রেণুতে যে শক্তি, সেই মহাশক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দে। দেখেছি তাঁকে বিদেশে কম্বুকণ্ঠে ভারতবর্ষের সত্যকে তুলে ধরতে, মিথ্যাকে মোহমুক্ত করতে, যীশুর মত অগ্নিবিচ্ছুরিত করে (pentecostal fire) মন্ত্র দিতে। তাঁরই মুখে শুনেছি—"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবলমাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো

দেবতাগণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা জাগ্রত—তোমার স্বজাতি ;—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না……এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশ-বাসীগণই তোমার উপাস্য—"।

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের চিন্তাসাগরমন্থনে একটি অমৃতোপম ফল হচ্ছে—মানবতাবাদ বা 'হিউম্যানিজম্'। আজ আমরা 'পারসোনালিজম্,' 'একসিস্‌টেনসিয়ালিজম্'-এর কথা বলছি কারণ 'হিউম্যানিজম'টা বন্ধ্যা 'বাদ'ই ছিল, 'বোধ' হয়ে উঠে 'বেদ' হয়নি। তবু দেখেছি জন হাওয়ার্ড নির্জন দ্বীপে কুষ্ঠরোগীর সেবা করেছেন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্স হয়েছেন, আব্রাহাম্ লিঙ্কন্ প্রাণ দিয়েছেন, টলষ্টয় বিতাড়িত হয়েছেন, বায়রন যুদ্ধ করেছেন, ম্যাজিনি গ্যারীবল্ডী শৌর্য প্রকাশ করেছেন, মিল বেন্থাম রুশো এমার্সন ওয়াল্ট হুইটম্যান স্বপ্ন দেখেছেন। এঁরাই 'Representative men'—মানুষের অধ্যাত্মসত্তার স্বীকৃতি এইখানে—সে শুধু তিন ডাইমেনশনের জীব নয়—প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে সে শুধু অধ্যায় নয়, সে আধার এবং আধেয়ও। এই কথাই ভারতবর্ষের, তার ঋষিদের, মনীষীদের, রামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের, অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের—

য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি,

কারণ, এষ দেবো বিশ্বকর্মা।

তাই বিবেকানন্দকে আজকে শুধু ব্যবহারিক জগতের ধর্মোদ্দীপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ দেখব না, বলব না যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ক্যাথলিক জগতের কাউন্টার রিফর্মেশনের মত ক্রিয়াশীল। বিবেকানন্দকে জাতীয়তার পুরোহিত বললেও সব বলা হবে না, যদিও সেকথা সত্যি যে তাঁর অগ্নিদীপ্ত বচন, অশোক অভয়মন্ত্র. উদাত্ত বাণী, চিন্তার ধারা অনেক স্বাধীনতাকামী তরুণকে অপূর্বভাবে উন্মথিত, উদ্বোধিত, উন্মোচিত করেছিল, ভাবজগতে একটা প্রচণ্ড আবহাওয়া (atmosphere) সৃষ্টি করেছিল।

বিবেকানন্দের ভাবধারার মধ্যে hard coreটি অবশ্য পরমপুরুষ শ্রীঠাকুরের উজ্জীবন মন্ত্র, কিন্তু আরো অনেক ধারা এসে তাকে ফুলে ফলে পল্লবে সমৃদ্ধ করেছে। তার মধ্যে আছে একটা

(১) Metaphysical Content বা ধর্মের দিক্

(২) একটা Sociological Synthesis বা সামাজিক সংহতির দিক্

(৩) একটা পূর্ণ ভারত-চেতনার স্বপ্ন বা স্বাদেশিক দিক্

সব মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ মনুষ্যনীতির উত্তরণ—সেখানে পূবে পশ্চিমে, হিন্দুতে খ্রীষ্টানে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানে, অর্থবান ও অর্থহীনে প্রভেদ থাকবে না,—সেখানে থাকবে সাত্ত্বিক চিন্তা, রাজসিক কর্মোদ্যম, সমষ্টিগত কল্যাণ, অন্ন-দেবতার উজ্জীবন, বিশ্বহিতে আত্মনিবেদন—বশিষ্ঠের মন্ত্র বিশ্বামিত্রের কর্ম-চাঞ্চল্যকে আত্মস্থ করবে বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্রে—এটা জীবনবাদ নয়, জীবনবোধও নয়, জীবনবেদ—a way of life নয়, তার প্রকাশ নয়, পরিণতিও, যাকে তিনি বলেছেন "প্র্যাকটিকাল বেদান্ত"। এই বেদান্তের অর্থ প্রচণ্ডভাবে প্রাণবান হওয়া…. তিনি বললেন—ধরে নিলাম, ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তোর মুক্তি হল। কিন্তু তাতে জগতের কি? সারা দুনিয়ার লোককে মুক্তি এনে দিতে হবে। আমরা মায়ার জগতে দাবানল জ্বালিয়ে দেব। তবে তুই অনন্ত সত্যসন্ধ হবি। সে সুখের নিবিড় উপলব্ধি, সে আকাশের মত অসীম অনন্তবোধ—কে তার মাপ করতে পারে? সে রকম মনের ভাব এলে তোর বাক্য হরে যাবে, নিজের নিজত্ব কোথায় ডুবে যাবে, তখন তুই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নিজেকে দেখবি, প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাবি। এই অনুভূতি এলে, জগতের সবাইকেই ভালবাসতে হবে, সকলের প্রতি অপরূপ প্রেম ও করুণার উদয় হবে। এর নাম যথার্থ বেদান্ত।

(শ্রীযুক্ত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত)

অবশ্য একথাও বলছেন সঙ্গে সঙ্গে—"ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না···দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস্।

(স্বামিশিষ্য সংবাদ)

তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে :

পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর।

তিনি শুধু বেদান্তের সূত্র মুখে আওড়ালেন না, জীবনের নিত্য-পরিক্রমায় ছড়িয়ে দিলেন :

"Stand up, assert yourself, proclaim the God in you. Do not deny him. It is a man-making religion that we want, man-making theories that we want. And here is the test of the truth—anything that makes you weak, physically and spiritually, reject as poison. Truth is strengthening. Truth is purity.

......Faith, faith, faith in ourselves. Do you feel that millions are starving today? Millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you sleepless? Has it made you also mad?

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধনার ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের চিন্তার ধারায় নানা স্রোত এসে মিশেছে। কিন্তু সবেরই মিলিত রসায়ন ঐ একই সুরে পৌঁচেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের, মৈত্রীর, ভালবাসার। মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্কও সেই পর্যায়ের। কিন্তু জীবনের অভিশাপ এই যে মুখে আদর্শগত সত্য হিসেবে গ্রহণ করলেও Man *end in itself* বা I deny the negation of Man এ ধরণের কথা ওঠেনি। তার মুখ্য কারণ—তার দরকার ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্জনের কাঠিন্য ছিল না, অর্জনের নৈপুণ্য ছিল। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই তার জ্ঞানীগুণী সাধকগোষ্ঠীর দল ধরতে চেয়েছেন এক মূল রহস্যকে। তাঁরা জানতে চেয়েছেন যা সৎও নয় অসৎও নয়, দিনও নয় রাত্রিও নয়, অন্তরীক্ষও নয় আকাশও নয় মৃত্যুও নয়, অমৃতও নয়, তবু অনির্বচনীয়। একদিকে যেমন ক্রিয়াকাণ্ড আবার আচমন, অগ্নিমন্থন, উদ্গীথের উপাসনা, অন্যদিকে তেমনি অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার, যিনি এক ও সবর্ণ তাঁরই স্মরণ ও মনন। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ কিন্তু তবু দেখি ক্ষত্রিয় জনক, অজাতশত্রু, প্রবাহণ, গাঙ্গায়নি উপদেশ দিচ্ছেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে, শুকদেবকে, গর্গবালাকিকে, সোমশুষ্মকে। শ্রুতি পেরিয়ে স্মৃতি যখন এলো তখনো নানা কাহিনীতে রামায়ণে মহাভারতে, জাতকে ভাগবতে সেই আদর্শের ধারা অক্ষুণ্ণ রইলো। মানুষ রাম, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানী তথাগত বা মহাবীর দেশকে অতিমানবতার দৃষ্টান্ত দেখালেও যুগ-চেতনাকে সংহত ও সংযত করবার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। গ্রীক্ হেলিওডোরাস হলেন পরম ভাগবত। ঐতিহাসিক যুগেও এর দুটি বড় প্রমাণ দেখেছি। ইসলাম এসেছে, প্রবল ভাবে ধাক্কা দিয়েছে তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নিয়ে, রাজশক্তির মহিমা নিয়ে, ভোগশক্তির উপকরণ নিয়ে। সত্য সনাতন নীলকণ্ঠ ভারতাত্মা তাকে বর্জন করেন নি, নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নতুন রূপে অবতীর্ণ হলেন। সারা ভারতবর্ষে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে এক অপূর্ব প্রেমের মন্ত্র বয়ে গেল বৈষ্ণবাচার্যদের বরে। নানক কবীর দাদু নতুন করে সমীকরণের মন্ত্র পড়লেন,

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

* * *

ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

আবার যেদিন পশ্চিম থেকে দুর্বার স্রোত এসে ধাক্কা দিলে সেদিনের ইতিহাসও ঐ এক প্যাটার্ণের। নিদ্রিত

ভারতাত্মা জেগে উঠে প্রতীচীর সত্যকে আত্মসাৎ করতে চাইলে। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে কবির অলস কল্পনা নয়, ইতিহাসের অমোঘ সূত্র। বাংলার তথা ভারতবর্ষের ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক ধারা বেয়ে এবং তারই একটি সার্থক সাফল্যের যুগ নির্ণয় করে আবির্ভূত হলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

চার্নকের চাণক্যনীতি যেদিন বৈঠকখানার বটযক্ষিণীর আওতায় রূপ নিলে, গোবিন্দপুর সুতানুটি মিলিয়ে গিয়ে কলকলিতা হয়ে উঠলো কলিকাতা, রঙ্গভরা বঙ্গদেশে চৌরঙ্গীনাথ চেপে বসলেন, বাদাবনে শার্দুলচিহ্নিত পথে নতুন করে জেগে উঠলো নবপদাবলীর চিহ্ন, সেদিন সাগর-পারে গড়ে উঠলো নবাবের দল, নতুন অর্থ ও আভিজাত্যের নেশায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো আর এক ঝড়—পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান, ধ্যানধারণা, ইতিহাসদর্শন, রাষ্ট্রবোধ। মহা আলোড়নের দিব্যকটাহে সুরু হলো মন্থন, উঠলো অমৃতকুম্ভের সঙ্গে বিষকলস, লক্ষ্মীর সঙ্গে উর্বশী। ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ নতুন করে ভাবতে লাগলেন বোধি বটদ্রুমের নীচে। ঊনবিংশ শতাব্দী হলো সক্রিয়। আলালের ঘরের দুলাল বাংলার কোলেই এই ভাবসাধনার উৎপত্তি, সেই শ্রীকণ্ঠরাই নীলকণ্ঠের মত বিষপান করলেন, আত্মস্থ হলেন, সমিধ সংগ্রহ করলেন, যজ্ঞসম্ভব মূর্তি গড়লেন। শ্রীঅরবিন্দ এই ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—A society electric with thought and loaded to the brim with passion. এর মধ্যে ছিল বেগ ও আবেগ, একটা pagan abandon, একটা শক্তি উন্মাদনা। একে শুধু অনুকরণ বলা চলে না, ভাববিনিময়ের ফলে একটা যোগজ রসায়ণও হলো। তাই ঊনবিংশ শতাব্দী পেলে হাজার বছরের বিস্তৃতি, ত্রিকালের ছাপ তার ত্রি কায়ে। মাটির স্পর্শ নিয়ে মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি—সেই অলঙ্ঘনীয় বীর্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লো যাত্রীর দল—পূর্বসূরীদের সংকেত তারা দেখেছে, শুনেছে নব আগন্তুকদের আভাস। বুকের প্রেম দিয়ে, ধমনীর রক্ত দিয়ে, বাহুর শক্তি দিয়ে, প্রবঞ্চিতের দাহ দিয়ে, হিংসাদ্বেষকামনা কলহকে তুচ্ছ না করে তারা এগিয়ে চললো, মাতাল পৃথিবীর কণ্ঠবিলগ্ন হয়ে যৌবনের গান শোনালে আবার আকাশের দিকে চেয়ে বিদ্যুৎ-বাহিনী এলোকেশীকে খুঁজলে। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, জগদীশ, প্রফুল্ল, অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রভৃতি আরো কতো তীর্থঙ্কর চললো। বাংলার ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও এর স্পর্শ পড়েছে। তিলক্, রানাডে, গোখলে, দয়ানন্দ, গান্ধীজী, রাধাকৃষ্ণন, রাজাজী, রমন্, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, সুব্রহ্মণ্য, ভল্লথোল ও সেই ইতিহাস-পথ-পথিক ভারতবর্ষের হোতা ও উদ্গাতা। আজ বিবেকানন্দের সঙ্গে সেই যুগকেও স্মরণ করবো আর যুগন্ধরদের।

আজকের দিনে এই প্রার্থনাই সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা যে ভারতবর্ষের সত্যকার বাণীই যেন জয়যুক্ত হয়—সে বাণী সকলের, সে বাণী বিশ্বের, সে বাণী কাহাকেও দূরে রাখে না, বর্জন করে না, সবাইকে ডেকে বলে আয়ন্তু—শৃণ্বন্তু—প্রাণ তুমি সংস্কারমুক্ত হও। এই বাণীর মহাসাগরে যুক্ত হয়েছেন সব দেশের সব মনীষীরা। সবার পরশে পবিত্র-করা এই নীর। এই বাণী জগদ্ধিতায় মন্ত্র উচ্চারণ করে……রবীন্দ্রনাথের কথায়—যাহা বিরাট্, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার তাহারই জয় হইবে, আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে :

'মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা'

এই ভূমিকায় এই সাধনায় এই তপস্যায় কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, সংঘ-সম্প্রদায় নেই। এই সাধনার মূর্ত পূর্ণ প্রতীক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। যত মত তত পথ। এই সাধনা যেন আমাদের কর্মবিমুখ না করে, তামসিকতায় লিপ্ত না করে, রাজসিকতায় মত্ত না করে, সাত্ত্বিকতায় অহংকৃত না করে। ভারতের সেই চিরন্তনী প্রকৃতিকে যেন আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, বিচার করে গ্রহণ করতে পারি, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পরি, প্রাণ দিয়া রক্ষা করতে পারি, নতুন করে রূপায়িত

করতে পারি। এই সাধনার যেখানে যেটুকু প্রকাশ—বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীতেই হোক, তপস্বীর আশ্রমেই হোক, সাহিত্যের দরবারেই হোক. বা সংসারের হাসি-কান্নাতেই হোক—তাকেই যেন আমরা সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করতে পারি, সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা দীনতা নীচতার উর্ধ্বে উঠে, মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্যের স্তর পেরিয়ে, স্বার্থক্ষুধান্ধ না হয়ে। আলোকপিয়াসী মানুষ খুঁজুক এক রসবন্ধ অমৃতভাণ্ডকে, যা মণ্ডিত করবে জীবনকাণ্ডকে নূতন সংহিতায়, অতন্দ্র গীতায়, ধ্যানের নৈঃশব্দ্যে, কর্মের প্রবাহে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণে, চাষীর মাঠে, গণচিত্তের উদ্বোধনে, প্রেমের রসতীর্থে, সাধকের মহাভাবে। কোথায় সে ক্ষেমঙ্কর দক্ষিণপাণি উত্তরসাধক যে বিবেকানন্দের স্বপ্নকে করবে সফল, বঞ্চনাবেদনার ইতিহাস পেরিয়ে, নবজাগ্রত চেতনা নিয়ে

A deeper dedication to the higher values of life. আজ শ্রীঅরবিন্দের "ভবানীমন্দিরের" কথা স্মরণ করবো—

ভারতবর্ষের নবজন্ম চাই, এই পুনর্জাগৃতি সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।

It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race that Bhagawan Ramakrishna came and Vivekananda preached.

বহ্নি-বাণী

মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই,……শক্তির বিকাশ চাই—হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নাই—ছেলেখেলার সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা, নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও ; ছড়াও, আগুনের মত যাও সব জায়গায়।

LIBRARY
No...........
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

আমেরিকায় স্বামীজীর ধর্ম-প্রচার

স্বামী নির্বেদানন্দ

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের তিন বছরেরও বেশী সময় বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করার জন্য এবং তৎসঙ্গে প্রিয় জন্মভূমির পুনরুন্নয়নার্থে পাশ্চাত্য যা কিছু দিতে পারে তা আহরণ করে নিয়ে আসার জন্য বিদেশে অশেষ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। হিন্দুধর্মের মহার্ঘ অবদানের সঙ্গে হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসীকে পরিচিত করানো এবং এভাবে তাদের সসম্ভ্রম দৃষ্টিপথে ভারতকে তুলে ধরা ছাড়াও স্বামীজী তাদের মনে বিশ্বাসও জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে ধর্মের মূল অংশের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যে মূল যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির ওপর জগতের সমস্ত ধর্মবিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে, তার ছবি তিনি তুলে ধরেছিলেন তাদের সম্মুখে। তিনি তাদের সজাগ করে দিয়েছিলেন যে সর্বজনীন ধর্মের মহান আদর্শ উপলব্ধি করতেই হবে, এবং তার জন্য চিন্তাকে প্রসারিত করে নিয়ে যেতে হবে সাম্প্রদায়িকতার সীমার ওপারে। এরূপ একটি সর্বজনীন ধর্মের এখন বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অন্তর্নিহিত হিন্দুবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শ্রোতাদের পরিচিত করে দেন। হিন্দু-বিশ্বাসের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার কথা, তার সর্বজনীন বাণীর অসীম উদারতার কথা, একই ভগবানকে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবিধ ভাবে প্রকাশ করার কথা তিনি তাদের শুনিয়েছিলেন। মানুষের সর্ববিধ রুচি, ধাত ও সামর্থ্যের উপযোগী প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—এই চারটি মূল ভাগে বিভক্ত হিন্দুধর্মের বহুবিধ সাধনপ্রণালীর কথাও তিনি বিবৃত করেছিলেন তাদের কাছে। কর্ম ও পুনর্জন্মবাদের কথা তিনি বুঝিয়েছিলেন; আর বুঝিয়েছিলেন হিন্দু মতানুসারে কিভাবে পরব্রহ্মরূপ চরমসত্যের সঙ্গে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি কারণে যুক্তির তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণও সহ্য করতে পারে, এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে কখনো তার কোন সংঘর্ষই বাধে না, সেকথাও যুক্তিবিচার দিয়ে তিনি ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি বেদান্তের উদার, বিশাল বাণীর মধ্যে সবধর্মের বিজ্ঞান যে নিহিত রয়েছে—একথা জোর করে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেদান্তকে অবলম্বন করলে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য অনুভব করা যায়; বেদান্তকে অবলম্বন করেই সর্বজনীন ধর্মরূপ অভিনব ভিত্তির উপর সকলে মিলিত হতে পারবে। এ সত্যটিও তিনি তাদের কাছে প্রকট করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের নিকট এমন একটি স্বর্ণময় সূত্র আছে, যা দিয়ে কাউকে খর্ব বা অঙ্গহীন না করেও সে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে পারে। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্য সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদের সিদ্ধান্তে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। সমালোচনামূলক যুক্তির বিরোধিতা কাটিয়ে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস আনার জন্য ও অপর ধর্মগুলিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখার জন্য মানবজাতির সকল শ্রেণীর লোকই বেদান্তের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর অগাধ ও বিপুলপ্রসারী উপলব্ধি সহায়ে এ সত্যটি বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর সেই চরম আবিষ্কারের কাহিনীই জগৎকে সিংহগর্জনে শুনিয়ে গেলেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপনিষদের উচ্চাঙ্গের উদার বাণীর পুনরুজ্জীবনই হিন্দু-পুনর্জাগরণ নিয়ে আসবে; আর সেই সঙ্গে জগতের সব ধর্মকেই একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করবে।

সেজন্য স্বামীজীর মতে হিন্দু-পুনর্জাগরণই হল বিশ্বজনীন ধর্মের শুভাগমন-বার্ত্তাবাহী অগ্রদূত।

গুরুর ও নিজের উপলব্ধির আলোকসম্পাতে উদ্ভাসিত হিন্দুশাস্ত্র হতে স্বামীজী ধর্ম সম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি আহরণ করে এনেছিলেন, যা আধুনিক যুগের বিদ্বৎসমাজের চাহিদার সর্বথা অনুকূল। পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর কথা শুনে ধর্মকে সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। "মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম"—স্বামীজীর মুখে ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা শুনে জনসাধারণের ধর্মবিরোধী মনোভাব কেটে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। স্বামীজীর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতরের একটা উন্নতি—যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে নিয়ে গিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়,—যেখানে পৌঁছে মানুষ তাঁর পূর্ণত্বের সব স্বপ্ন ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার রূপ নিজেরই অন্তরে দেখতে পায়, এবং দেখে, যে স্বর্গরাজ্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা তার অন্তরে চিরদিনই বিদ্যমান ছিল। কোন কিছুর ক্রমবিকাশ বললেই বোঝা যায় যে আগে থেকে সেটা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই ক্রমবিবর্তিত মানুষের পূর্ণত্ব নিশ্চয়ই তার অন্তরেই বীজাকারে বর্তমান থাকে। এই প্রচ্ছন্ন পূর্ণত্বকে বিকশিত করার জন্য মানুষ তার সমস্ত চিন্তায়, সমস্ত কর্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সচেষ্ট থাকে।

মানুষ যখন নিজ প্রকৃতিকে জয় করে ফেলে তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, 'স্বর্গবাসী পিতা'. যতখানি পূর্ণ, ততখানিই পূর্ণ হয়। আর দেখে যে প্রকৃতির নিত্যমুক্ত নিয়ন্তা, পূর্ণতা ও চিরমুক্তির মূর্তবিগ্রহ ভগবানই হচ্ছেন তার নিজের সত্তার স্বরূপ। এই অবস্থালাভের নামই ধর্মলাভ। সেজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম পুস্তকেও নাই, বুদ্ধির ধারণাতেও নাই, যুক্তিতেও নাই। যুক্তি-কল্পিত মতবাদ, প্রমাণ, শাস্ত্রোপদেশ, গ্রন্থ, ধর্মবিচার, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান—এসবই হচ্ছে ধর্মের সহায়কমাত্র; আসল ধর্ম হল উপলব্ধি।" সেজন্যে ধর্মের কথা বলতে গিয়ে শুধু শাস্ত্র-প্রমাণ, প্রথা ও অনুশাসনের ওপর তিনি জোর দেননি, অতিপ্রাকৃতিকতা টেনে এনে বিষয়টাকে ঘোলাটে করে তোলেননি; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুগ সাধারণ বুদ্ধিতে যেসব বিষয় ও ভাবগুলির সমর্থন পাওয়া যায় না, যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই সেগুলি মেনে নিতে হবে, একথা তিনি কাউকে বলেননি। তিনি ধর্মকে, "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে—এরূপ যুক্তিসঙ্গত ধারণা চিকাগোর জন্ হেনেস্ হোম্‌সের (John Haynes Holmes) আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যায়: "ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটা সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব। ধর্মকে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে অভিহিত করলে ধর্মের কিছুই বলা হ'ল না। চাতুরী বা কল্পনাপ্রসূত কুসংস্কারও বলা যায় না একে। ধর্ম হচ্ছে মানবপ্রকৃতির উচ্চতর স্তরের ক্রিয়াকলাপের নিছক অনুভূতি মাত্র।"

এর পর স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক প্রবণতা মাত্র নয়—ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের সর্বজনীন সত্য। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পূর্ণত্ব লাভ করার এবং অনন্ত জীবন, আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত সংস্কার। মানুষের স্বভাবই তাকে সর্ববিধ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করার অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে। অন্তঃপ্রকৃতি মানুষকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিরদিন চোখ বুজে থাকতে দেয় না; জড়প্রকৃতির অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের উদ্দেশ্যে একটা চির-অস্তিত্বের অবলম্বনভূমি খুঁজে বের করার জন্য তার ভেতর থেকে অনুপ্রেরণা জাগে। জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী; কোন জাগতিক বস্তুর বিয়োগে হৃদয়ে যখন প্রচণ্ড আঘাত লাগে, মানুষ তখন একটা বাস্তব অবলম্বন খুঁজে বের করতে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এমন একটা অবলম্বন—যার সঙ্গে চিরদিন সে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। জগৎ মানুষকে বড়জোর তার গোটা জীবৎকালটাই ভুলিয়ে রাখতে পারে, তার কাছে সত্য ও সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়ে তার সমগ্র মন ও শক্তি দখল করে থাকতে পারে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কিন্তু "সে মানুষের কাছেও মৃত্যু আসে—সে মানুষও প্রশ্ন করতে বাধ্য হয় 'এ কি সত্য?' এই প্রশ্নের সঙ্গেই ধর্মের আরম্ভ, আর এর উত্তরে তার সমাপ্তি।" সত্য, চিরন্তন, পূর্ণ ও চিরমুক্ত আদর্শের জন্য, অর্থাৎ ভগবানের জন্য, যে সর্বজনীন অন্বেষণ, তার উদ্ভব হয় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্মানুপ্রেরণা হতেই। এজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, মানুষের গড়নের ভেতরেই ধর্মভাব ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। এতদূর পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে যতক্ষণ সে দেহমন ত্যাগ না করতে পারছে, যতক্ষণ সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব।" স্বামীজী ধর্মকে মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক ও সর্বজনীন ঘটনা বলে নিজ অভিমত প্রকাশ করায় পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর এই ধারণার মধ্যে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান লাভ করেছিল। আর সে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের তৎকালীন রুচির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েও গিয়েছিল। স্বামীজীর ভাবেরই প্রতিধ্বনি তুলে হ্যাভেলক এলিস্ (Havelock Ellis) ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন, "আধ্যাত্মিক ক্রিয়া"রূপে, "যা প্রায় মানসিক ক্রিয়ারই মত।"

স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়-রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার জন্য এই অবিরাম প্রয়াস—মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কল্যাণের, এর চেয়ে বেশী গৌরবের আর কিছুই নাই।" ধর্মকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন, স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিবিধায়ক ক্রিয়ারূপে অভিহিত করা ছাড়াও স্বামীজী একে সর্বোত্তম সুখের আকর বলে ঘোষণা করে গেছেন। বলেছেন, "দেহগঠন যত নিম্নস্তরের হয়, প্রাণীর ইন্দ্রিয়সুখের অনুভূতি হয় তত বেশী তীব্র। একটা কুকুর বা একটা নেকড়ে যতটা আনন্দ নিয়ে খায়, খুব কম লোকই সেভাবে খেতে পারে। কিন্তু কুকুর বা নেকড়ের সব সুখই যেন ইন্দ্রিয়ের সীমাতেই কেন্দ্রীভূত। সর্বজাতির নিম্নস্তরের লোকেরা ইন্দ্রিয়সুখ নিয়েই মেতে থাকে; আর শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা আনন্দ আহরণ করে চিন্তারাজ্যে—দর্শন, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিকতা আরো উচ্চস্তরের জিনিস। বিষয়টি অসীম বলে তার স্তরও সর্বোচ্চ; আর যাদের ধারণা করার শক্তি আছে, তাদের কাছে এর আনন্দও সর্বোত্তম।" "মানুষ আনন্দ চায়, কাজেই উপযোগিতার দিক থেকেও ধর্মচর্চা করা উচিত; যত রকমের আনন্দ আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ নিহিত রয়েছে ধর্মে।"

তবু, উপযোগিতার নিক্তিতে ওজন করে ধর্মের মূল্য নির্ধারণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি শিখিয়েছেন যে চিরন্তন সত্যের বরণীয় অন্বেষণরূপে ধর্ম নিজেই নিজের পুরস্কার। উপযোগিতা দেখে যাঁরা মূল্য নির্ধারণ করেন, তাঁদের তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই বলে, "প্রয়োজন-সিদ্ধি ও অর্থের মান দিয়ে সত্যের বিচার করা উচিত—এ প্রশ্ন তোলার কি অধিকার আছে মানুষের? যদি ধরা যায় ধর্ম দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না, তাতে তার সত্যতা কি কিছু কমবে? প্রয়োজন-সিদ্ধি সত্যের মাপকাটি নয়।" তবু, সব বিষয়েই যাঁরা 'টাকা-আনা-পাই' হিসেব করে চলেন, তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য স্বামীজী দেখিয়েছেন, কি ভাবে ধর্মচর্চা বা পূর্ণতালাভের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সহায়ক হয়, এবং অসীম শক্তি ও আনন্দের অধিকারী করে তোলে তাকে। আরো একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে শুধু ব্যষ্টি নয়, ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ সমাজও ধর্মের দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ, দেখা যায়, সমাজের প্রাণের পুষ্টিসাধনের জন্য ধর্ম সবচেয়ে বেশী শক্তিমান ও সবচেয়ে বেশী হিতকর। দৃঢ়কণ্ঠে স্বামীজী ঘোষণা করেছেন "মানবজাতির ভাগ্য-নির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনটিই, যে শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি, তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী শক্তিমান নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার পটভূমি।"…

এভাবে যুক্তিপূর্ণ কথায় ধর্মের মূলতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

এবং সর্বজনীন ধর্মের মহান রূপ অতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে স্বামীজী বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী, যা শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁর নিজের উপলব্ধিতে পুনঃপ্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল, জগতে প্রচার করে গেছেন; প্রচার করেছেন জগতের বিভিন্ন ধর্মগুলির অন্তরে প্রাণসঞ্চার করার জন্য, এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সমালোচনামূলক যুক্তির আক্রমণের মুখে সেগুলির আত্মরক্ষায় সহায়তা করার জন্য।*

* মূল গ্রন্থ *Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance* হইতে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

বহ্নি-বাণী

অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও, আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না তখনই পার হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিবে না।……কার্যের আরম্ভ সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না। সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবন-সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর।

LIBRARY
No..............
Shri Shri ... mayee Ashram
BANAR...

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৪৫ বছর বয়সে
(মিসেস ওলি বুলের ব্যবস্থানুসারে গৃহীত ফটো)

"যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।
জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

শ্রীউমাশংকর সরকার

বিবেকানন্দের কবিতা : তার রূপ ও স্বরূপ

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে বিশ্বজগৎ আজ শ্রদ্ধা দিয়েছে, পূজা দিয়েছে; কিন্তু আমার দুঃখ এই, কবিদের যিনি কবি, ক্রান্তদর্শী মহান কবি—দেশের লোক তাঁকে আজও ঠিকমত জানে না। এক এক সময় আমার মনে হয় —তিনি কবি ছিলেন বলেই সত্যকার সন্ন্যাসী হতে পেরেছিলেন, কবি ছিলেন বলেই—ছিলেন মানবপ্রেমিক প্রসন্ন বৈরাগী। তাঁর কর্ম, তাঁর কথা, তাঁর সাধনা, তাঁর সংগ্রামচেতনা—সংক্ষেপে তাঁর সমগ্র জীবনই মহাকাব্যের মহৎ চৈতন্যের মতই ব্যঞ্জনাগর্ভ।

মাত্র কয়েকটি কবিতাই, কিছু ইংরেজীতে, কিছু সংস্কৃতে ও কিছু বাঙলায়—তিনি লিখেছিলেন। সংখ্যায় অল্প হলেও গুণগৌরবে তা যে মন্দ নয়, সেকথা বলাই এস্থলে বাহুল্য। কবিতা যাঁরা পড়েন এবং ঠিকমত বোঝেন, তাঁরাই জানেন কত বড় মহৎ ভাবের রসরূপ তিনি অঙ্কন করেছিলেন তাঁর কাব্যচ্ছন্দে।

ক্ষুৎপিপাসাকাতর আটপৌরে জীবনের 'বিকার'গুলির সুযোগে তিনি কাব্য করেন নি, মানুষের জীবনে যা শ্রেয়, যা সুন্দর, মহৎ ও গুহাহিত গভীর—ছন্দে বা বচনে যা ধরতেই পারাই প্রায় অসাধ্য, কবি বিবেকানন্দ সহজ আনন্দেই তা ধরেছেন, রূপ দিয়েছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন। 'মৃত্যুরূপা মাতা' যাঁর কলম থেকে বেরয়, তিনি কি শুধু ভাবুকদের ভাবুক, নগ্ন কবিদের কবি, মহাকবি?

বেদান্তে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় জীবনের কথা বলা হয়েছে; আর বলা হয়েছে বিজ্ঞানময় সত্তা ও আনন্দ-চৈতন্যের তত্ত্বকথা। বিবেকানন্দের কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে বিজ্ঞানসত্তা ও আনন্দচৈতন্য :

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর?
পাবে না তো হেথা, কিংবা এর পর;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ;
নিজহস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বলো হে সন্ন্যাসি
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

—আমির মধ্যেই বন্ধন, আমির মধ্যেই মুক্তি। বন্ধনে থাকি বলেই সন্ন্যাসীর গীতিতে রস পাই নে; মুক্তির মধ্যে যদি আসি, ভিন্নতর ভাবচেতনার রসে পূর্ণ হবে অন্তরাত্মা। তখন বুঝব—'সন্ন্যাসী'র এই তত্ত্ব-গীতিকায় মহাবিশ্ব-জীবনের অভিনব রসব্যঞ্জনা।

সেকেলে বলে আমাকে গাল দিতে হয় দিন, কিন্তু আমি জানি—প্রেমবৈরাগ্যের দিব্য লাবণ্য বিবেকানন্দের কাব্যচ্ছন্দে, স্থিতপ্রজ্ঞ ভাবসমাধির অমিতোল্লাস তাঁর বক্তব্যমূলের প্রাণস্পন্দে :

একমাত্র নরবর, এক সেই প্রভু,
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি,
কুহেলী-সন্দেহঘেরা যত পথ ছিল
ঘৃণাভরে ত্যজিলেন তিনি,
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন,
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান,—
'মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনেও তাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।'

—সুখ নয়, দুঃখও নয়, নির্বাণ, কিনা মুক্তিই জীবনের কাম্য। মৃত্যু নয়, জীবন নয়, মুক্তি, কিনা ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের আরাধ্য। এই ব্রহ্মসাযুজ্য বা মুক্তিভাবের ভাবুক যিনি, ব্রহ্ম তাঁর কাছে শূন্যবাদ নয়, পরম পূর্ণের আনন্দ। এই আনন্দের রসভাষ্যকার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষিকবি তাঁর সতীর্থ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কবি

ভগবান তাঁর সগোত্র। ‘প্রকৃতি’র কবিগাথক তিনি নন, ‘পুরুষে’র তিনি কবিসাধক।

যথার্থ ভাগবতী কবিতা বিবেকানন্দই লিখেছেন এবং আধুনিককালে সত্যকার বৈরাগ্যবাণী তাঁর কবিতাতেই প্রমূর্ত হয়েছে প্রেমের আনন্দচ্ছন্দে।

এমন কবি বর্তমান যুগে জনসাধারণের চিত্ত যে আকর্ষণ করবেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কবি সেকথা জানতেন। আত্মগতভাবে তাই বলেছেন :

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়,
অ-তত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয়।

কিন্তু তাই বলে কি ভয় পেতে হবে? অর্বাচীন সমালোচকদের মুখ চেয়ে তাদের মনোমত কথা লিখতে হবে? না, সন্ন্যাসী-কবির কর্তব্য তা নয়। কি তাঁর কর্তব্য? না,

স্বাধীন উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে—
মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।

—ব্যক্তিগত ‘সুখের অন্বেষণে’ না মেতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে করো উদ্ধার। কি হবে তাতে? সাধনায় সিদ্ধি হবে, মহাশক্তির কৃপা লাভ হবে :

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

সমালোচক মহল, বর্তমানে, এ-জাতীয় কবিতা সম্ভবতঃ পছন্দই করেন না। এ-যুগে প্রকৃতিরতি-ই রসিকমানসে তরঙ্গ তোলে, যা তাঁদের সহজ হৃদয়ে আছে, আছে সহজ-স্বভাবে, তারই প্রতিচ্ছায়া তাঁরা কাব্যশিল্পে দেখতে চান। বিবেকানন্দ, বলাই বাহুল্য, তাঁদের কোনোকালে-ই তুষ্ট করেন নি। আর এই কারণেই বোধহয়, বাঙলার সাহিত্যেতিহাসে কবি বিবেকানন্দের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই।

কবি বিবেকানন্দের কবিতাগুচ্ছের রীতিমত সমালোচনা আজ হওয়া দরকার। তাঁর কবিস্বভাব ও কবিপ্রতিভার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর কর্মশক্তি, ব্রহ্ম-চৈতন্য, বিশ্বপ্রেম ও প্রেমিকতা—এটি স্থিরভাবে আজ ভাবা দরকার। মানুষের মন বিজ্ঞানাভিসারী হয়ে যে আনন্দ আস্বাদ করে, আনন্দ-চৈতন্যের আশীর্বাদ পেয়ে যে মহামন্ত্রের সুরমূর্ছনা তোলে—সেই ‘আনন্দ’ ও সেই ‘মন্ত্রের’ সম্যক্ আলোচনা হলে কবিতাশিল্পের একটি রুদ্ধ দুয়ার আমাদের সম্মুখে অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে : সঙ্গে সঙ্গে, একথা একান্তভাবেই সত্য, যে, নবতর একটি নূতন জীবনবোধের দিব্যচেতনায় মন ও মনন সুর্যরহস্যের সন্ধানে দীপ্যমান হয়ে উঠবে। তখন মনে হবে, অবশ্যই মনে হবে :

নহি স্বর্গবাসী আমি, নর পশু নয়,
পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ মন,
স্তম্ভিত নির্বাক যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়,
স্বরূপ বর্ণিতে মোর—আমি সেই সোঽহম্॥

LIBRARY
No............ 11|290
Sri Shri ... ...ndamayee Ashram
BANARAS.

মহাজীবন

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু

ভূমার আনন্দ বুকে মাতৃভূমি কর জ্যোতির্ময় হে মহাজীবন।
বিশ্ববেদনার দূত, বীরাচারী তাপস নির্ভয়, হে সত্যশরণ।
অভয়ার বর লাগি এ যুগের অধিদেবতারে কর নমস্কার।
শক্তিপূজা-বেদীতলে শুচিশুভ্র জীবনের জয় প্রার্থনা তোমার।
সে সাধনা পূর্ণ তব আত্মসাক্ষাতের মন্ত্র লভি' মহাগুরুপাশে।
জীবনে জ্যোতির শিখা জ্বলে হলে সমুজ্জ্বল সবি বিপুল আশ্বাসে।
প্রজ্ঞাদীপ্ত হৃদয়ের অন্তহীন শান্ত মহিমায় উদ্ভাসি নয়ন।
আনিলে এ বিশ্ব 'পরে দীপ্ত বহ্নি মূর্ত দেবদূত মহা জাগরণ।
আলো আঁধারের পারে জেনেছিলে মহান্তপুরুষে হেথায় প্রথম।
ধরিত্রীর বেদগাথা ভারতের পুণ্য তপোবনে লয়েছে জনম।
অনন্ত কালের পথে শতাব্দীর প্রলয় তিমিরে পুণ্য আরাধনা।
জাগায়েছে বারে বারে মানবের মগ্ন চেতনারে সত্য সে সাধনা।
তারি ছায়া নিল কায়া বঙ্গভূমে নব কলেবরে জ্যোতিঃ-সমুজ্জ্বল।
সেই পুণ্য প্রস্রবণ সিক্ত করে ভাগীরথীতীরে, পঞ্চবটীতল।
ক্ষতি নাই, ক্ষত নাই, আছে শুধু অনন্ত সাধনা, অনন্ত জীবন।
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, নাহিক মুক্তির মোহমায়া, আছে জাগরণ।
জীবধাত্রী ধরণীর সুশ্যামল প্রাণের আসারে জাগিবে গৌরবে।
এই তব অভিলাষ অকলুষ দ্বিধাহীন বাণী প্রচারিলে সবে।
দেখেছ কল্যাণরূপ নবজীবনের অমৃত-স্পন্দন সে দৃষ্টি অক্ষয়।
জীবে শিবে নাহি ভেদ, জগৎ জীবন জড় অচেতন সবি ব্রহ্মময়।
আত্মার বন্ধনহীন সঙ্গীতে শুনালে চিরন্তন অগ্নিগর্ভবাণী।
স্বল্পে তুষ্ট থেকোনাক ভূমানন্দে ভরি লও মন অসত্যেরে হানি।
নবজীবনের কবি, কাব্য তব মহাজিজ্ঞাসার চিরন্তন গীতি।
বিবেকের বহ্নিদীপ্ত অনন্তের পথে অভিসার ভূমানন্দে নিতি।
জ্ঞানের শাণিত খড়্গে ছিন্ন করি ভয়জালরাশি উচ্চারিলে "অভীঃ"।
মূর্তিমান অভীঃ মন্ত্র, বেদান্তকেশরী বিশ্বগ্রাসী পূর্ণতার ছবি।

সে আলেখ্য জ্যোতিঃ-শুভ্র দীপ্তবীর্য সন্ন্যাসমূরতি মহিমা-মণ্ডিত।
বিশ্বজীবনের পথে জনবন্দনার ঐকতানে হল সম্পূজিত।
নবযুগ-বোধিসত্ত্ব কৃচ্ছ্রসাধনার দুর্বার আবেগে বোধির দুয়ার
খুলে দিলে ডেকে নিলে বিশ্বমানবেরে অনুরাগে ; সে প্রেম অপার।
সেই প্রেমে দীক্ষা নিল সুদূর প্রতীচী কাছে আসি তীর্থযাত্রীসম।
সে প্রেম চিরায়ু জানি নবারুণ-আলোক উদ্ভাসি মূর্ত অনুপম।
তপস্যার হোমবহ্নি জ্বালো হৃদে ভস্ম করি দিতে ক্লিন্ন গ্লানিভার।
উল্কাসম ছুটিয়াছ এ বিশ্বের অন্তহীন পথে তোমা নমস্কার।
অজ্ঞতার অন্ধকূপে মানবাত্মা মুক্তি কামনায় ধুঁকে ধুঁকে মরে।
বঞ্চনার বেদীমূলে মনুষ্যত্ব বিলাঞ্ছিত হেথা যুগ যুগ ধরে।
অমৃতের পুত্র যারা তারও হেন মরণ-যন্ত্রণা জন্মভরি ব্যথা ?
মুক্তি সে কি মরীচিকা তার লাগি বৃথা এ কামনা মিথ্যা ব্যাকুলতা ?
কি হবে সে ধর্মে হায় নিত্য যেথা মানবতাবোধ ধূলায় লুণ্ঠিত।
চাহি মূর্ত মনুষ্যত্ব দুঃখী দীনে আশ্রয় প্রবোধ দিতে অকুণ্ঠিত।
"সে ধর্ম মানি না আমি," বলেছিলে, "ঈশ্বর নিষ্ঠুর, দেয় না যে রুটি।"
বঞ্চিত লাঞ্ছিত আর্ত, ফুকারিছে ক্ষুধার্ত আতুর অন্ন চাই দুটি।
"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু" একসূত্রে গ্রথিত জগৎ তারি সেবা তরে।
ভ্রমিয়াছ দেশে দেশে লঙ্ঘিয়াই সমুদ্র পর্বত বর্ষ বর্ষ ধরে।
কে গো তুমি হে সন্ন্যাসী, ভুল নাই সংসারের কথা শ্রেয় কামনায়।
জীবনের সর্বকাম সমিধ ইন্ধনে জ্বালায়েছ যজ্ঞ-বেদিকায়।
সেই জ্ঞানবহ্নিধূম স্নেহাঞ্জন পরাল নয়নে ধন্য ধন্য তুমি।
দ্বিধাহীন ভাবনায় নত করি সর্বদেহ মন ও চরণ চুমি।
শতাব্দীর হে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মবিদ্ বঙ্গের নন্দন মুক্তির পূজারী।
তব বীর্যাধার হতে বজ্রবহ্নিকণা মোরা যেন তুলে নিতে পারি।
দীনতার হীনতার ভীরুতার পঙ্ককুণ্ড হতে তুলে লও তারে।
নবীন বঙ্গেরে ডাকি পুনর্বার দীক্ষা দাও ঋষি, সত্যের দুয়ারে।

শিবপূজা

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটী বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া"—"(প্রকাশ করিবে)। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন; কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব-ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চির-কালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া, তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে অল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণ করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন

পূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভ করিয়া ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃত-কৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান্ যদি কখনও দিন দেন ত আজ যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ : দিব্যভাব।

আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের পূজা—ইহাদের পূজা করিতে হইবে সেবা নহে, সেবা বলিতে আমার অভিপ্রেত ভাবটী ঠিক বুঝাইবে না। পূজা শব্দেই ঐ ভাবটী ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ—এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসীগণের পূজা করিতে হইবে।

সর্বোপরি আমার ভগবান হলেন তাঁরা যাঁরা দুঃখী, সর্বদেশের দরিদ্র আর যাঁদের সকলে দুষ্ট বলে ঘৃণা করে। তাঁরাই আমার বিশেষ পূজার পাত্র।

কখন ভুলিও না স্ত্রী জাতি এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উন্নতিসাধন। ইহাই আমার মূলমন্ত্র। পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব' আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব', দরিদ্র, অজ্ঞান, কাতর, ইহারাই তোমাদের দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ;
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বিবেকানন্দ

স্বামীজী দেশকে ও দেশবাসীকে জানবার জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। রাজা, মহারাজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুচি, মেথর সকলের সঙ্গেই সমভাবে মিশিয়াছেন, তাহাদের অন্তরের মর্মকথার সন্ধানে।

কন্যাকুমারিকায় ভারতের শেষ প্রস্তরে বসিয়া তিনি ভারতমাতার পূজা করেন। পূজান্তে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না! ঐ গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ওদের চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে মাড়িয়েছি।"

মূর্খ ও দরিদ্র নারায়ণদের মুখে দুটি অন্নের সংস্থান করিতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করিলেন। সুদূর আমেরিকাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রচার করিবেন। বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নারায়ণদের পূজা করিবেন। ইহাই তাঁহার মূল সিদ্ধান্ত।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে আসিয়া আলমবাজার মঠে আছেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী হিমালয় ভ্রমণের পর মঠে আসিলেন। কিছুকাল পরে আবার হিমালয় যাইবার বাসনা জাগিল। প্রথমে বাংলা-দেশের তীর্থাদি দর্শন করিবেন। পরে হিমালয় যাইবেন।

নবদ্বীপ দর্শন করিয়া মুর্শিদাবাদের পথে চলিয়াছেন। তখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাথ বালকদের দেখিয়া খুবই দুঃখ হয়। হাতে মাত্র চার আনা পয়সা। মুড়ি কিনিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। দলে দলে সব আসিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই দিতে পারিতেছিলেন না। যে কোন প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিবেন ভাবিয়া তীর্থভ্রমণের বাসনা ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সেবাব্রতে ঝাঁপ দিলেন। স্বামীজীর নিকট খবর পৌঁছিল। তিনি জানাইলেন,

BANARAS

"সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজীকী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেবো!!!" পত্রপাঠ সংকল্প করিলেন, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

পরে তিনি অনাথ বালকনারায়ণদের সেবায় ব্রত হইলেন। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। চরকা কাটা ও তাঁতের কাজ শিখাইতে লাগিলেন, যাহাতে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়। জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠানটি রূপ ধারণ করিয়াছে। আজ তাহাতে বহু গরীব ছেলে শিক্ষালাভ করিতেছে। তিনিই সেবাধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

বেলুড়মঠ স্থাপনের পর একদিন জনৈক শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে বলিলেন, "বসে বসে কি করছিস, যানা, হরিদ্বার, হৃষিকেশে। আহা! সাধুদের মুখে একটু জল দেবার কেহই নাই। তাঁদের সেবা করতে পারবি?" শিষ্য রাজী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি উপায়ে সেবা করব?' স্বামীজী বলিলেন, "কেন ভিক্ষা করে দুইটি পয়সা সংগ্রহ করবি। এক পয়সায় একটা মাটীর ভাঁড়ে গঙ্গাজল আর এক পয়সার বাতাসা আনবি। বাতাসা মুখে দিয়ে গঙ্গাজল দিবি।"

শিষ্য গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া যাত্রা করিল হরিদ্বারের পথে। কাশীতে তিনজন নিষ্কাম কর্মীর সঙ্গে দেখা। দুঃস্থ নারায়ণদের সেবা করিতেছে। রাস্তার পাশের অসহায় দুঃস্থদের আনিয়া স্থানাভাবে লোকের বাড়ীর দাওয়াতে রাখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিত। সম্বল ভিক্ষালব্ধ চার আনা পয়সা।"

এই সেবাকার্য দেখিয়া কল্যাণানন্দ বলিলেন, "ভাই তোমরা ত স্বামীজীর ভাবধারার অনুপ্রেরণায় কাজ করিতেছ। তিনি আমাকে হরিদ্বারে ঐ কাজের জন্য আদেশ করিয়াছেন।"

ঐ নিষ্কাম কর্মীদের আন্তরিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠে। আজ উহা বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছে। সেবকগণ স্বামীজীর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইল। দুইজন সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিল।

কল্যাণানন্দজী হরিদ্বারে সেবাকার্য আরম্ভ করিলেন। একটি ভাঙ্গা বাড়ীতে। সেবা কাজ চলিতেছে কিন্তু অর্থাভাব। উপযুক্ত ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা নাই। আবার বস্ত্রেরও অভাব।

ঐ অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, "যা কল্যাণের সাহায্য কর গিয়ে।" শিষ্য হরিদ্বারে আসিল। তিনি নিশ্চয়ানন্দ। গুরুভ্রাতার সহায়তায় তৎপর হইলেন।

দুঃস্থদের সেবা করিত বলিয়া তাঁহারা ভাঙ্গী সাধু নামে খ্যাত হইল। নিজেদের অন্নের সংস্থান ছিল না। কোন আস্তানা হইতে ভিক্ষা মিলিত না। কারণ উহারা নীচ শ্রেণীর সাধু। কাজেই দূর গ্রামান্তর হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্নে স্বকার্যে রত থাকিতেন। এই ভাবে গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের দৈনন্দিন কাজ চলিতে লাগিল।

নিশ্চয়ানন্দজী গুরুবাক্য বেদবাণী মনে করিয়া সাধু সেবায় তৎপর। প্রত্যূষে যাত্রা করিলেন। প্রায় পনর মাইল পথ হৃষিকেশ। যানবাহন নাই। নিবিড় জঙ্গল। হিংস্র জানোয়ারের সদা বিচরণ। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পদব্রজে চলিয়াছেন নির্ভীক সন্ন্যাসী, অভীষ্টসাধনে। ভিক্ষান্নে কার্য সমাধা করিয়া সন্ধ্যায় ফিরিলেন আস্তানায়। ইহাই তাঁহার নিত্যকর্ম চলিয়াছিল।

সাধুগণ তাঁহাদের সেবা করিতেন কিন্তু কোন আস্তানায় তাঁহাদের স্থান ছিল না। এমনকি ভাণ্ডারাতেও নিমন্ত্রণ হইত না। একটি সমষ্টি ভাণ্ডারাতে পণ্ডিতপ্রবর প্রবীণ সন্ন্যাসী ধনরাজগিরি আসিলেন। কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দুইজন মহাত্মা কোথায়?" আস্তানার সাধুজী বললেন, "তাঁহারা ভাঙ্গী (মেথর) সাধু। তাঁদের এখানে স্থান নাই।" প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাঁহারা না আসিলে আমি বসিব না। উপস্থিত সাধুমণ্ডলীকে খাইতে দাও।" সকলেই অনাহারে আছে। মহাত্মাদ্বয় আসিলেন। পাশে বসাইয়া প্রধান সন্ন্যাসী সকলের সঙ্গে আহার করিলেন।

ইহা সত্বেও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। ১৯১১ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী

মহারাজ আশ্রমে দুর্গাপূজা করিলেন। ঐ সময় সমস্ত সাধুমণ্ডলী মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি সাধু সমাজে স্থান হইল।

ঐ গুরুভ্রাতৃদ্বয় গুরুর আদেশে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস সেবাকার্যে ত্যাগ করেন।

শ্রীগুরুর আশীর্বাদে ও আন্তরিক একনিষ্ঠ সেবার ফলে আজ প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু সন্ন্যাসী সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতেও সুস্থ হইয়া আপ্তকাম লাভ করিতেছেন।

আজকাল জগতের সর্বত্র স্বামীজীর ভাবধারার অনুপ্রেরণায় বহু প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

এই সেবাই শিবপূজা।

বহুর্জনহিতায় বহুজনসুখায়।
আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ ॥

বহ্নি-বাণী

কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে, সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকরী-শক্তি ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে নাই, আছে সত্য-ধর্ম্মের মর্ম্ম-ভাগের উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জগৎটাকে নানা দুঃখ দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়াও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীর-হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে উঠো—উঠো, কাজ কর।

LIBRARY
No............ 11290
Sri Sri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

স্বামী বিবেকানন্দ ও সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচেতনা

শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকোৎসব ভারতের জাতীয় জীবনে এক গভীর সংকটের মুহূর্তে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। উত্তর সীমান্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নির্লজ্জ আক্রমণে আমাদের রাষ্ট্রিক আদর্শগুলি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বীকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্তমান অনেক রাষ্ট্রেই আজ অসমর্থিত এবং প্রতিহত। এমন অবস্থায় বিবেকানন্দের রাষ্ট্রিক ভাবনার আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। অবশ্য এ আলোচনার সূত্রপাতেই একথা স্মরণীয় যে স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমে প্রোজ্জ্বল বাণী ও রচনাতে রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে তিনি পৃথক্ ভাবে বিশদ আলোচনা করেন নি। তাঁর যুগের সংস্কারভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমিত রূপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন বলেই দেশোন্নতির জন্য নিছক রাজনৈতিক কার্যকলাপকে তিনি কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অবশ্য তিনি যে সমসাময়িক চিন্তার জগতে সমস্ত নূতন আন্দোলনের সংবাদ রাখতেন তার বহু প্রমাণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। লোকমান্য তিলক প্রমুখ তদানীন্তন জাতীয় আন্দোলনের অনেক নেতাই তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লণ্ডনে তাঁর বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবর্গের অনেকেই সোৎসাহে যোগদান করতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাঁরা বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন। "কংগ্রেসের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই তাঁহাকে নব্যভারতের অন্যতম নেতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-রচিত 'বিবেকান্দ চরিত', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৩২০)।...তবে শুধু এ-সমস্ত কারণেই আজ বিবেকানন্দের রাষ্ট্রিক ভাবনার পুনরাবিষ্কার প্রয়োজনীয় নয়, তাঁর জীবনসাধনায় ও দর্শনে মানবজীবনের সামগ্রিক রূপটি বিধৃত হয়েছে। রাষ্ট্রিক আদর্শ মানবসত্যের অতীত নয়, তাই স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রিক আদর্শ প্রচার না করলেও তাঁর রচনার রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কোনও কোনও লেখক এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বামীজী প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে "revivalist" ছিলেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশসহকারে এদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ-সিদ্ধান্তের একদেশদর্শিতা স্পষ্ট হয়। ডিরোজিও-র প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও রামমোহনের মনীষার উজ্জ্বল আলোকে যে-যুগের সূচনা, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব সে যুগের গতির বিরোধী কোনও আকস্মিক বিক্ষোভ নয়। রামমোহনের পরে, দীর্ঘ এক শতাব্দীর দীর্ঘতর সমাজসংস্কারের লীলাভিনয় যখন প্রায় সাঙ্গ হয়ে, যবনিকা পড়ে-পড়ে, সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মায়াবাদের উপর সমাজসংস্কারের সৌধ নির্মাণের যে অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে সমগ্র শতাব্দীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল।" (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, ১৩৬৩ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩)।

অবশ্য এদেশে শিক্ষিত সমাজের যে-অংশটি ভারসাম্য হারিয়ে সমাজসংস্কারকে একটি প্রহসনের বিষয় করে তুলেছিলেন তার প্রতি স্বামীজীর কোনও সহানুভূতি ছিল না। দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন এই উগ্র সংস্কারমোহকে তিনি কুসংস্কারেরই নামান্তর বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯০০

খৃষ্টাব্দে "লাহোর কন্ফারেন্সের" সভাপতিরূপে প্রখ্যাত বিচারপতি রানাডে যে-অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য ছিল। স্বামীজী এই অভিভাষণের নির্ভীক প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজসংস্কারের নামে অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার বিরোধী ছিলেন বলে এমন সিদ্ধান্ত করা অসংগত হবে যে তিনি পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। এ-প্রসঙ্গে তাঁর যে বিখ্যাত উক্তিটি শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে (বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ১৫৮) উদ্ধৃত করেছেন তা সংস্কারক বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর উদাহরণ : "সনাতন সত্যসমূহ মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না, অনন্ত কাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থায় ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুজ্ঞেয় কর্তব্য-সমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সেগুলি পরিবর্তন হয়। একথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্তন হইতেছে। ...বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে। সময়-স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ হইবে। আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভালো পথে পরিচালিত করিবেন। সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।"

এ কোনও তথাকথিত "revivalist"-এর উক্তি নয়। প্রচলিত প্রতিটি কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার করুণ প্রয়াসকে বিবেকানন্দ কখনও সমর্থন করেন নি। "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য, অতএব মোরা ছাড়িব কার্য" এরকম ধারণাকে তিনি তাঁর কোনও রচনায় কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রত্যাঘাত বলে বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা বিবেকানন্দ-বাণীর তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি, এমন সিদ্ধান্ত অনুচিত নয়। প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক আলোচনার ভিত্তিতে স্বামীজী সমাজসংস্কারে উদার অভিব্যক্তিমূলক পদ্ধতির সমর্থন করেছেন। অসামান্য বিশ্লেষণী প্রতিভার প্রসাদে তিনি জেনেছিলেন যে ধর্মের বা সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করলেই চলবে না, সেইসঙ্গে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র ও জ্ঞানেরও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন তখনই স্থায়ী ও শুভফলপ্রদ হয় যখন তা সংস্কারপ্রার্থী লোকমতের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবিংশশতাব্দীর আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির সমস্ত সার্থক প্রয়াসের মধ্যে আজ এই দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য স্বীকৃত। প্রতীচ্যের উন্নত দেশগুলিতেও যন্ত্র-কৌশলের অভাবনীয় উন্নতির মধ্যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অভাবনীয় পরিসমাপ্তির যে সম্ভাবনা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে সে-সংকটেও প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য আজ Aldous Huxley প্রমুখ অনেক মনীষী নূতন করে আবিষ্কার করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ভারতবর্ষে নানা স্থানে (বিশেষ করে মাদ্রাজে ও কলকাতায়) স্বামীজী যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মূল কথাটি ছিল জাতীয় উন্নতির জন্য শক্তির আবাহন। এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত অসম্ভব নয় যে স্বামীজী রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে "শক্তিমতবাদে"র সমর্থক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানীতে নীট্শের দর্শনে শক্তিমান "অতিমানবে"র (Supermen) জন্য যে আকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল এবং যে-আহ্বানের বিকৃত প্রতিধ্বনি ট্রাইট্স্কে, ফন বার্নহার্ডি এবং জঙ্গীবাদী একনায়কতন্ত্রের বর্তমান শতকের সমর্থকদের রচনায় পাওয়া যায়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভারতে সেই শক্তিকেই

আবাহন করেছিলেন এ কথা মনে হতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর বাণী ও রচনার সামান্য অনুধাবনেও এ-ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। যে-শক্তির কথা, যে 'অভীঃ' মন্ত্রের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন তা রাষ্ট্রনীতির শক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শক্তিতাত্ত্বিকেরা তাঁদের মতবাদে ভাগ্যবান্ মুষ্টিমেয়ের ("élite"এর) অপ্রতিহত পশু-শক্তিরই জয়গান করেছেন। জনগণের সমবেত দাবীর গুরুত্ব তাঁদের তত্ত্বে অস্বীকৃত। দেশবাসীর প্রতি গভীর মমতায় বিবেকানন্দ যে-শক্তির উদ্বোধনে এদেশের যুবক-সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন তা কোনও বিশেষ ভাগ্যবান্ গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় আসীন করার জন্য নয়, অসংখ্য দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের জাগরণের পথেই ছিল তাঁর আহ্বান। প্রকৃত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু এই নেতৃত্ব যেন স্বার্থপর মুষ্টিমেয়ের সীমাহীন অধিকারে পর্যবসিত না হয় সে-সম্বন্ধেও সকলকে সজাগ ও সতর্ক করেছিলেন। স্বামীজীর এই অবদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে, বিচিত্র ত্যাগে ফলচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী।"…(রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড়মঠ, প্রকাশিত ১৯৬১ সালের 'সন্দীপন' ২য় সংখ্যা থেকে স্বামী অপূর্বানন্দের 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে উদ্ধৃত) বলা বাহুল্য যে "দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ে"র সঙ্গে নীট্‌শে-কল্পিত অতিমানবের কোনোই মিল নেই।

* * *

যদিও বিবেকানন্দের রাষ্ট্রিক ভাবনার উৎস সামগ্রিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ, তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়সাধনার অব্যবহিত প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর চিন্তাধারার সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব। এদেশে পশ্চিমের শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সংশয়বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসেন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসে তরুণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মিলন এক যুগান্তকারী ঘটনা। যুক্তিবাদ ও বিশ্লেষণী ধারার সঙ্গে ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব হ'ল দিনে দিনে। জীবনব্যাপী সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমন্বয়ের সত্যদৃষ্টিতে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং যার অভিনব সুন্দর প্রকাশ "যত মত, তত পথ" উক্তিতে তা নরেন্দ্রনাথের প্রখর যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিনির্ভর জীবনে দিক্-পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। পরবর্তী কালে অদ্বৈত বেদান্তের পরম জ্ঞানের উচ্চশীর্ষ থেকেও তাই বিবেকানন্দ জীবনসাধনার সমস্ত আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে "গ্রহণ করিবার মিলন করিবার সৃজন করিবার প্রতিভা" বলে বর্ণনা করেছেন সেই প্রতিভার উৎস যে গভীর সমন্বয়-বোধে, তার মধ্যেই স্বামীজীর রাষ্ট্রিক চিন্তার বীজ নিহিত। পরমতসহিষ্ণুতার (toleration) ও উর্ধ্বে সমস্ত সাধনাকে গ্রহণ ("accept") করার গভীর তাৎপর্য শুধু ধর্ম-সাধনাতেই নয়, রাষ্ট্রিক জীবনেও লক্ষণীয়। এর বর্ণনাই রোম্যাঁ রোলাঁ অপূর্ব ভাষায় তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীতে করেছেন :

"I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages than this enfolding of all the gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human dreams……They (i. e. Ramakrishna and Vivekananda) have carried the great message of fraternity to all believers, to all visionaries, to all who have neither belief nor vision, but who seek for them in all sincerity, to all men of goodwill, rationalists and religious men……And not merely the fraternity of the first-born, whose right

as the eldest dispossesses and subjects his younger brethren, but equality of rights and privileges"......(ইংরেজী সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ পৃঃ ৩০৬)।

এই সাম্য এবং মতপ্রকাশের এ-স্বাধীনতা প্রকৃত ও আদর্শ গণতন্ত্রেই সম্ভব। এই আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আমাদের সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলিতে রাষ্ট্রিক জীবনের লক্ষ্য হিসেবে উল্লিখিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধারণাকে স্বীকার করতে হ'লে স্বার্থপর উগ্র জাতীয়তাবাদের (যাকে দেশানুরাগ বলে ভুল করা হয়ে থাকে এবং যার পরিণতি পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদে) উর্ধ্বে জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্যকে গ্রহণ করতে হবে। সকল জাতির, সকল সামাজিক ব্যবস্থার সহাবস্থানের মধ্যেই প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ সম্ভব। প্রতিটি জাতির স্বকীয় স্বাধীন বিকাশের পথে যে বাধাগুলি আছে তা অপসারিত করতে হবে, কারণ ব্যক্তির পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনই পরধর্ম ভয়াবহ। কেবল পরানুকরণের ভিত্তিতে জাতিগঠন সম্ভব নয়। অন্যদের কাছে যা শিক্ষণীয় তা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে তা করলে চলবে না ম্যাট্সিনীর বিখ্যাত উক্তি "Nation is Mission" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হবে, সমগ্র মানবতার সেবায় তার বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হবে। প্রতিটি জাতির নিজস্ব অবদানের সত্য স্বামীজী ইতিহাসনিষ্ঠ মন দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "We ought never to think of taking away the characteristics of any nation even if it can be proved that its character is composed of faults."

যেহেতু ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে আছে ধর্ম, তাই ধর্মের ভিত্তিতেই এদেশের উন্নতি সম্ভব। রাষ্ট্রিক বিভাগে ধর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই মতের ব্যাখ্যা তাঁর সামগ্রিক সমন্বয়-তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করতে হবে। কোনও বিশেষ 'denominational, ধর্মের কথা স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে বলেন নি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই সর্বজনীন ধর্ম (Universal Religion) যার প্রেরণা শাশ্বত এবং যার প্রকাশ যুগভেদে বিচিত্র। মূলতঃ এর সার্থকতা মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে আবিষ্কার করার মধ্যে। সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনও বিশেষ ধর্মমতের একাধিপত্য বা বিশেষ প্রতিষ্ঠা নেই বলেই তা গর্হিত নয়; বরং বলা যায় যে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের প্রতি 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টি যে-'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে থাকে সেখানেই শাশ্বত সর্বজনীন ধর্মের প্রকৃত স্বীকৃতি সম্ভব।

বর্তমান যুগে শাশ্বত ধর্মের অপরূপ প্রকাশ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র বাণীতে। 'বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থ সেবানুষ্ঠানের মধ্যেই এ-যুগের প্রধান সমস্যার সমাধান সম্ভব। বার বার তাই স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের অবহেলিততম মানুষের মধ্যে দেবতাকে আবিষ্কার করেছেন। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগদান করবার জন্য আমেরিকায় পৌঁছে প্রাথমিক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় অনুরাগী আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে (২০শে অগস্ট, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ) লিখেছিলেন, "হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি।"

এই "দায়" এবং এ-প্রেরণা স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মুক্তি-আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে, এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমাজসচেতন ব্যাপ্তিতে এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম ও সংগঠনের আদর্শে এ-প্রেরণাই ছিল প্রধান। "মুদির দোকান, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা হাট বাজার ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বতে"র মধ্যে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যে "নূতন ভারত"কে আবিষ্কার করেছিলেন তারই বিকাশ-সম্ভাবনা আজ

জাতীয় পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে তার সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবধারার সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্বশান্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা—জাতীয় বিকাশের এ-তিনটি মূলসূত্রেরই স্বীকৃতি ও সমর্থন স্বামীজীর জীবনদর্শনে পাওয়া যায়। সংকটের মুহূর্তে ভারতের যে নিরাভরণ কঠিন শুভ্র উজ্জ্বল রূপ আজ জগতের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত, বিবেকানন্দ তাঁর অভয়বাণীতে সেই রূপেরই আবাহন করেছিলেন। আজ থেকে শতবর্ষ আগে যাঁর ভাস্বর আবির্ভাব সেই সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ তাই এদেশের (এবং অন্য সকল শান্তিকামী ও স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী দেশের) সার্বভৌম বিকাশে প্রেরণা দেবে। আক্রমণকারীর বর্বর লোভকে প্রতিহত করে প্রকৃত ও সংহত জাতীয়তাবোধের আদর্শে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে মানবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় "বিরাটে"র সার্থক পূজায় সকলকে আহ্বান করবে।

বহ্নি-বাণী

শক্তি-ফক্তি কেউ কি দেয়? উহা তোর ভিতরেই রয়েছে, সময় হলে আপনা আপনিই বেরিয়ে পড়বে। তুই কাযে লেগে যা না; দেখ্‌বি এত শক্তি আস্‌বে যে সাম্‌লাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু কায করলে ভিতরে শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।

স্বামীজীর আশা

শ্রীবীরেশ্বর দাস

শতবর্ষ-পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর নানাদেশে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও অনুরাগী মনীষিবৃন্দ নানাভাবে তাঁর অলোকসামান্য জীবনকাহিনীর, তাঁর প্রাণপ্রদায়িনী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করছেন।

স্বামীজী নিজে কি করতে চেয়েছিলেন, আর তাঁর স্বদেশবাসীকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিলেন—এই দুই বিষয়ে আলোচনা ও অনুধাবনের প্রয়োজন, তাঁর বাণী জগতে প্রথম প্রচারের সময় যতটা ছিল, আজ ৬০।৭০ বৎসর পরে ততটাই আছে। বরং একথা বলা চলে, বিচিত্র ভাব ও আদর্শের সংঘাতে বিভ্রান্ত ভারতবাসীর নিকট সে প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। আর একটা কথা। যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব যুগসন্ধি-ক্ষণে—যে কালে ধর্মগ্লানি অত্যন্ত গভীর হয়—হয়ে থাকে। তাঁদের জীবদ্দশায় খুব বেশি লোক তাঁদের বাণীর নিগূঢ় অর্থ সর্বতোভাবে উপলব্ধি করতে এবং তদনুসারে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে পেরে উঠেন না। যত দিন যায়, তাঁদের শিক্ষার প্রভাব সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে সমাজকে নূতন আদর্শে পরিচালিত করতে থাকে।

এই দীর্ঘকাল ধরে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী নানা জনে নানাভাবে আলোচনা করেছেন ও করছেন। তাঁর বাণী ও রচনার মধ্যে যে বিরাট হৃদয়ের, যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই, তা সমগ্রভাবে ধারণা করার সামর্থ্য বা ধৈর্য আমাদের থাকে না; যখন যে বাণীটি পড়া বা শোনা যায় সেইটা আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে আমাদিগকে চমৎকৃত ও উদ্দীপিত করে—তখনকার জন্য মনে হয়, স্বামীজী এইটিই চেয়েছিলেন। এইভাবে মহাপুরুষগণের শিক্ষা আংশিকভাবে গ্রহণের ফলে যুগে যুগে নানা মতবাদের, নানা অবান্তর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বামীজী যখন বলেন, "আমি একজন সমাজতন্ত্রী," আর লেখেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

তখন কি মনে হয় না, সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে এই সন্ন্যাসীও একজন সমাজতন্ত্রী বনে গেছেন? স্বামীজীর ছোট ভাই মনস্বী ৺ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বরচিত স্বামীজীর 'জীবনীতে এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন তাঁর মার্কসবাদ-প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

যখন তাঁর মুখে শুনি—"কোথায়, ইতিহাসের কোন্ যুগে, আপনাদের ধনী ও অভিজাতসম্প্রদায় পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীন দুঃখীর জন্য ভেবেছে?" "ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা। পাজি বেটারা চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষেছে আর দু'পা দিয়ে দলেছে।" "পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যে তারা যেন ঘুরপাক খেতে খেতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে—ব্রাহ্মণই হোন, সন্ন্যাসী হোন আর যে-ই হোন।"

তখন ভাবনা হয়, স্বামীজী তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সংস্কারকগণকে "সমাজের মস্তকে অগ্নিবর্ষণ-কারী" ব'লে অভিহিত করলেও তাঁর বাক্যবাণের জ্বালা তো কিছু কম নয়। মনে হয়, সমাজকে ওলটপালট করে ফেলে ভেঙেচুরে নূতন করে না গড়লে বুঝি তাঁর মতে দেশের কল্যাণের আর উপায় নেই।

"বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাতে করে' গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন, অন্ন! যে ভগবান্ আমাকে ইহলোকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি পরকালে আমাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না।" "যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক মুঠো অন্ন দিতে পারেন না সেই ধর্মে বা সেই ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।"

ইহকাল-পরকালের সকল-ভোগ-ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করে শুধু ঈশ্বরলাভের জন্য যিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, সংসারের সকল উপকরণ উপেক্ষা করে দণ্ড-কমণ্ডলু-কৌপীন সম্বল হয়েছেন, তাঁর মুখে যখন শুনি, ভোগবিলাসের উপকরণ বাড়াও—যখন মনে হয় পাশ্চাত্যের অতুল ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে দেশের আর্থিক উন্নতি বিধানই তাঁর একমাত্র কাম্য হয়ে পড়েছে।

"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, লাখ নরকে যাব; বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ (বসন্তকালের ন্যায় লোকহিত-সাধন যাঁরা করেন তাঁদের ন্যায়)—এই আমার জীবনের ব্রত।" "ওরে বাবা, এমন দিন কি হবে যে পরোপকারায় জান্ যাবে! ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড়লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল।"

একথা যে সন্ন্যাসী বলেন তাঁকে আধুনিক পাশ্চাত্য ঢঙের এক মানবতাবাদী (Humanist) বললে আপত্তি কি!

"আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননীজন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হো'ন।" "স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা কেড়ে নাও; তার ফলে হবে দ্রুত অবনতি।" "চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর জীবন, উন্নতি ও কল্যাণ।" "ভারতমাতা অন্ততঃ এক হাজার বলি চান; মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।" এগিয়ে যাও, এগিয়ে। অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না। কে পড়ে গেল দেখতে যেয়ো না। Onward, Onward, Forward! হরে হরে।"

এ সকল কথার মধ্যে যেন শুনি স্বাধীনতাকামী রণসাজে সজ্জিত সেনানায়কের আহ্বান। শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারকারী, প্রাণোন্মাদক স্বামীজীর এই আহ্বানে আসমুদ্রহিমাচল উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল—হাজার বছরের পরাধীনতার ভারে মৃতপ্রায় জাতির প্রাণে নবীন আশার সঞ্চার হয়েছিল—এক হাজার নয়, হাজার হাজার যুবক দেশমাতৃকার সেবার জন্য অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা বরণ করেছিল, কতশত তাজা তরুণ প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে প্রমাণ করেছিল, স্বামীজীর আহ্বান ব্যর্থ হয়নি।

অতএব, হোন না তিনি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, জন্মভূমির দাসত্বশৃংখলমোচনই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। কুর্মস্তারকচর্বণং পৃথিবীমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্? রামকৃষ্ণদাসাঃ বয়ম্॥ 'আকাশের তারা চিবিয়ে খাব, পৃথিবীকে সবলে স্থানচ্যুত করে ফেলব। আমরা কারা তা কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণের দাস।" স্বামীজী যখন হুহুংকার ছেড়ে এই কথা বলেন তখন লোকে ভাবে—বাপরে! লোকটার কী অহংকার! আর অহংকারের মূলটা কোথায়? না, তিনি রামকৃষ্ণের দাস। দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলা পূজারী বামুন, 'মা, মা' করে কেঁদে কেটে যার জীবনটা গেল—তাঁর অনুগত বলে' এতো বড়াই!

হ্যাঁ, ঠিক তো তাই। এতো বিশ্বাস, এতো শক্তি, এতো সাহস শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে আশ্রয় নিয়েই পেয়েছিলেন সার্থকনামা বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ, সমাজসংস্কারক বিবেকানন্দ, স্বাধীনতাকামী বিবেকানন্দ, মানবমিত্র বিবেকানন্দ, লোকনায়ক বিবেকানন্দ,—নরেন্দ্রনাথের এ সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল সেই পূজারী ব্রাহ্মণের সংস্রবে আসার ফলে, তাঁরই প্রভাবে।

শুধু ভারতের নয়, পরন্তু সমগ্র জগতের ধর্মগ্লানি দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। "শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন তাহা

দেখাইবার জন্য তিনি বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।” কিন্তু তাঁর প্রয়োজন ছিল এক উপযুক্ত মাধ্যমের—যাঁর সহায়তায় তিনি তাঁর ভাবকে ভাষণ দিতে পারবেন; প্রয়োজন ছিল এমন একজন উত্তরসাধকের যিনি শুধু ভারতভূমিতে নয়, জড়বিজ্ঞানবলদৃপ্ত নাস্তিক্য- ও -সংশয়বাদপ্রমত্ত পাশ্চাত্যেও তাঁর বাণী প্রচার করতে পারবেন। তাই তিনি বেছে নিলেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কুশাগ্রধী ছাত্র পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানঅধ্যয়নের ফলে সংশয়াকুল কিন্তু সত্যান্বেষী নরেন্দ্রনাথকে। কয়েক বৎসর ধরে বোঝাপড়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন শোনালেন নববেদান্তের একটি সূত্র—‘জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে সেবা।’ শুনলেন অনেকে, কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে এর নিগূঢ় অর্থের মর্মানুধাবন করতে পারলেন একা নরেন্দ্রনাথ। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন, তাঁর সকল বাণী—এই একটি সূত্রের বিরাট ভাষ্য।

নরেন্দ্রনাথ একজন বড় উকীলের ছেলে ছিলেন, নিজেও ওকালতি পড়েছিলেন। ইচ্ছা করলে একজন নামজাদা উকীল হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে, মানযশের অধিকারী হতে পারতেন। হতে পারতেন একজন মস্ত বড় সমাজসংস্কারক। রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে, শুধু বাগ্মিতার জোরে নয়, তাঁর অসামান্য হৃদয়বত্তার জন্য সমগ্রদেশকে নিজের পিছনে টানতে পারতেন; গঠনকৌশল-সহায়ে বিদেশী রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এর কোনটাই হলেন না; শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসে শিক্ষালাভের ফলে হলেন সন্ন্যাসী।

এ কেমন সন্ন্যাসী! গুরুকৃপায় ও সাধনসহায়ে অদ্বৈতানুভূতির চরমশিখরে পৌঁছুলেন; কিন্তু একাকী পরমানন্দ-আস্বাদনে তৃপ্ত থাকতে তাঁর প্রাণ চাইল না,—স্বদেশবাসীর গভীর অজ্ঞতা, জড়ত্ব, দুঃখ-দারিদ্র্য টেনে আনল তাঁকে জনতার মাঝে। নিজের কোন অভাববোধ থেকে নয়, ইহকালে সুখভোগ বা পরকালে স্বর্গাদিলাভের কামনায় নয়, শুধু বিশ্বমানবের অনন্ত দুঃখরাশি নিবারণ-কল্পে সিদ্ধার্থ যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং বোধিলাভের পর আজীবন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করে মানুষকে দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার উপায় শিখিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথও বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে হলেন বুদ্ধদেবের ন্যায় পথচারী। তবে, বুদ্ধদেব আত্যন্তিক দুঃখনাশের জন্য আধ্যাত্মিক-উপায়-মাত্রের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজী মানবজীবনের নিত্যসঙ্গী ‘রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা’ প্রভৃতি কোন দুঃখকে, বা, সাধারণ জীবনের কোন সুখ কোন আনন্দকে তুচ্ছ করে দেখেন নি; লৌকিক দুঃখ নিবারণের জন্য লৌকিক উপায় উদ্ভাবনেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন; যে মানুষ যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থার পরবর্তী বিভিন্ন স্তর দেখিয়ে তাকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে নিতে চেয়েছিলেন। ঘোর তমোগুণীর মধ্যে চেয়েছেন তিনি প্রবল রজোগুণের সংস্কার করতে; তাকে উৎসাহ দিয়েছেন বীর্য প্রকাশ করে বসুন্ধরা ভোগ করতে, টেনে হিঁচড়ে তাকে একেবারে সত্ত্বগুণে নিতে চান নি। জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে দেখেছিলেন, তার মধ্যে ঐহিক ও পারমার্থিকের ভেদরেখা টানেন নি। জীবনের সকল কর্ম সকল চেষ্টার মধ্যে জীব যে তার চৈতন্য- ও আনন্দ- স্বরূপ অভিব্যক্ত করতে প্রয়াস করছে, এইটা তিনি চেয়েছিলেন বোঝাতে—আর সেই অভিব্যক্তির পথের বাধা অপসারণ করতে তিনি করে-ছিলেন বিপুল প্রয়াস।

সুদূর অতীতে আমাদের এই পবিত্র ভারতভূমির ঋষিগণ জীবন ও জগতের রহস্য বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়ে সব কিছুর মূলে এক অদ্বয়তত্ত্বের আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্বকে তাঁরা ব্রহ্মনামে অভিহিত করেন আর ইহাকে মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত করার জন্য সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করেন। সচ্চিদানন্দব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, আর জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর এদেশের অগণিত সাধক দেহমনঃপ্রাণ অর্পণ করে তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এবং চরম সত্য সাক্ষাৎকারের ফলে ব্যক্তিগত জীবন সার্থক করেছেন। এই তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে শত শত জটিল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বান্বেষণের

শ্রীউমাশংকর সরকার

সুফল অল্প-সংখ্যক নিষ্ঠাবান্ সাধক নিজেদের জীবনে পেয়েছেন—জনজীবন এই তত্ত্ব থেকে লাভবান্ হয়নি।

জড়প্রায় জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চারের জন্য স্বামীজী প্রথমে চাইলেন—আত্মবিদ্যার প্রচার করতে—বনের বেদান্তকে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। অসংখ্য বক্তৃতায় ও চিঠিপত্রে তিনি তাঁর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। ভারতী-সম্পাদিকাকে তিনি লিখছেন, "প্রথমে চাই আত্মবিদ্যা। ঐ কথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ডকমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি যে জ্ঞানে ভববন্ধন হ'তে মুক্তি পাওয়া যায় তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।...এই জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধ মহাপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই আত্মা, তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্যে।...অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক আর নাই হোক, সেই শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত। সেই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে গিয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে।"

এই উদ্দেশ্যে-সাধনের ভাবনা বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছে স্বামীজীর জীবনকে। যে পুণ্য ভারতভূমিতে আত্মার মহিমা সর্বপ্রথম অনুভূত ও প্রচারিত হয়েছিল সেই দেশে সাধারণ মানুষের অবমাননা, তাদের দৈন্য, তাদের "জড়ত্ব ও পশুত্ব" তাঁর হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথিত করেছিল তাই তাঁর সমগ্র চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল অজ্ঞান-পঙ্কে নিমজ্জিত ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে এবং সেই উপায়ের ব্যবহারিক প্রয়োগে। তাঁর মানবতাবাদ কেবলমাত্র জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অভাবের পূর্তির দ্বারা জগতের দুঃখ নিবারণে পর্যবসিত হয়। তিনি চেয়েছেন, আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে এক নূতন মানবসমাজ গঠন করতে, এক নূতন সভ্যতার প্রবর্তন করতে—যে সমাজে কর্মের সাধনায় ও সামাজিক আচরণে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সুর ধ্বনিত হবে—যে সমাজে কোন মানুষ অবজ্ঞাত বা কোনপ্রকারে বঞ্চিত হবে না। তিনি বলছেন, 'আমার জীবনের এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটা চক্র প্রবর্তন করব, যা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসকল বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক, তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলবে।" আবার বলছেন, "আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাইরে মানুষ যে মহাচিন্তাসমূহ সৃজন করেছে সে সব অতি হীন অতি দরিদ্রের নিকট প্রচার। তার পর তারা নিজেরা ভাবুক।"

স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলছেন, "যদি আমি সংসারত্যাগ না করতাম তা হলে আমার মহান্ গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে সত্য প্রকাশিত হতো না। আর তা ছাড়া, যে সকল যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করার জন্য সুদৃঢ় পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই বা কী অবস্থা হতো? তারা ভারতের, বিশেষ করে বাঙ্গলা দেশের কল্যাণসাধন করেছে।...আমি এই যুবকদলকে সংঘবদ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। আর শুধু এরা নয়, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা দুর্দমনীয় তরঙ্গের আকারে ভারতভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে যারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও উৎপীড়িত তাদের দ্বারে দ্বারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নীতিধর্ম ও শিক্ষা বয়ে নিয়ে যাবে—এইটি আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। আমি হয় এই ব্রত উদ্‌যাপিত করব, বা এই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।"

তাঁর আশা অপূর্ণ থাকেনি। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রবর্তিত নবযুগধর্মচক্র তিনি শুধু ভারতের উপর নয়, পাশ্চাত্যভূমির উপরও চালিত করেছেন—আর যত দিন যাচ্ছে সেই চক্রে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। মানুষকে তিনি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, প্রতিটি ব্যক্তির প্রত্যেক সমাজের যে অভাব যে অপূর্ণতা আছে তার পূরণ করে'। তাই তিনি চেয়েছিলেন শিল্পবিজ্ঞানে

বাহুভোগসমৃদ্ধ ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার—আর অধ্যাত্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের দ্বারা দরিদ্র ভারতবাসীর ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। ভারতের যুবকগণের প্রতি তাঁর আকুল আহ্বান বিফল হয়নি—হাজার হাজার যুবক তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাঁর বাণীর যে যতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে ততটুকু নিয়ে দেশের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করেছে। "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে বল, "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" স্বামীজীর এই বজ্রগর্ভ বাণী যেন মহাত্মা গান্ধীতে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সুচিরকাল নিদ্রিত গণদেবতার সুপ্তিভঙ্গ হয়েছে। জগতের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের চাঞ্চল্য, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। ভ্রান্ত মতবাদের প্রভাবে সেই প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণীবিরোধের সৃষ্টি করে' অশান্তি আনয়ন করলেও সাধারণ মানুষ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়েছে জগতের ইতিহাসে তা কখনও ঘটেনি। জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য এখন প্রয়োজন এই উদ্বুদ্ধ গণচেতনাকে সুপথে পরিচালিত করার। সাম্যবাদিগণ যে শ্রেণীহীন শোষণহীন শাসনহীন আদর্শ সমাজের কল্পনা করেন সে সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ অধিকার-নিরাকৃতের মধ্যে ভোগ-লালসা ও হিংসা উদ্দীপ্ত করে নয়, প্রতি কিন্তু মানুষের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ করে, প্রত্যেকের অন্তরে যে জ্ঞান প্রেম ও শক্তি আছে তার প্রকাশে সহায়তা করে। পশুবল প্রয়োগের দ্বারা সমাজে শান্তি ও সাম্য স্থাপন কখনও সম্ভব হবে না; আবার, যতদিন সমাজে একটা ক্ষুদ্র অংশেরও ধারণা থাকবে যে অবহেলিত ও অধিকারনিরাকৃত ততদিন তারা ভোগাধিকার-সাম্যের জন্য বলপ্রয়োগ করতে থাকবে।

স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের এই ভারতভূমিতে, এই মহামানবের সাগরতীরে বহুধাবিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ও সভ্যতার এবং চিন্তাধারার সংঘর্ষ, আর তার পরিণামে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বর্তমান যুগেও আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই ভারতভূমিতে। তাই বিধাতার অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে এখানে মহাসমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্ম আবির্ভাব হয়েছে। এ-যুগে জগতের সমস্যা যেমন বিপুল, আদর্শের সংঘাত যেরূপ বহুমুখী, সমন্বয় সাধিত হবে সেই প্রকারে মানবসাধনার সকল ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এই সমন্বয়ের ভিত্তি স্বামীজী প্রস্তুত করেছেন বনের বেদান্তকে সমাজের মধ্যে টেনে এনে ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগের কৌশল শিক্ষা দিয়ে। মানুষের মাঝে দেবতার অভিব্যক্তির যে আশা নিয়ে সারা জগতে তিনি বেদান্তের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন তাঁর সে আশা সফল হবেই হবে। সত্যযুগ-আবির্ভাবের যে সুখস্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হবে।

ভারতপুরুষ

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

সপ্ত-ঋষির তপোলোক ত্যজি এলে এ মরতে হে মহাপ্রাণ,
উদ্ভাসি জড় আঁধার অতল জ্যোতি-শতদল বিশ্ব-ত্রাণ।
সে মহা-উদয়ে জাগে শতাব্দ জাগ্রত-আঁখি ভুবন চায়,
ধ্বনিত বিশ্ব বিহ্বল যুগ-সূর্যের জয়-বন্দনায়।
নব জনমের আবেশে মুক্ত মহিমায় দিলে কি প্রাণ-দ্যুতি!
দীপ্তি-প্লাবনে জীর্ণ জীবন রচিছে অমর অর্ঘ্য-স্তুতি।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নব মন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা,
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

তন্ত্র তোমার অনল-আখরে পঞ্জরতলে লিখেছ যোগী,
দেবতা তারাই—ব্যর্থ বিকল হতাদর চির-দুঃখভোগী।
শিখালে মেথর নহে ত ইতর ভেদাভেদ সব নিয়েছ মুছি,
শূদ্র ক্ষুদ্র নহে নরমাঝে এ মহাসমাজে মুচিও শুচি।
অজ্ঞ অবোধ আছে যে যেথায় নহে নহে হীন অধম কভু,
সব অন্তরে একই ভগবান বিরাজিন প্রেমে বিশ্বপ্রভু।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নব মন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা।
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

এ দেব-ভূমির কল্যাণ লাগি' হে ধ্যানী ও মনে কত না আশা!
কত সাধনায় মর্ম নিঙাড়ি ভেঙে এল গাঢ় অমৃত ভাষা।
সে বাণী ধ্বনিল দিক হতে দিকে—ওঠ, জাগো, হের মেলিয়া চোখ,
তুচ্ছ স্বার্থ এস পিছে ফেলি' উচ্ছ্বসে যেথা বিশাল শোক।
সিংহ-সাহসে এস বীর এস, বজ্র-স্বননে রণিছে ভেরী,
কি ভয়, পুত্র অমৃতেরি মোরা, যাত্রা ত পথে অনন্তেরি।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নবমন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা,
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

দেশে দেশে গিরি-গহ্বরে বনে পথে প্রান্তরে ফিরেছ হাঁটি,
শিরে মহাকাশ, নয়নে করুণা, পদতলে দূর-বিসারী মাটি।
হেরেছ মানুষে নিতি রূপে তার কুটিরে প্রাসাদে খামারে ক্ষেতে,
হেরেছ কি ক্রূর হিংসা দীনতা বেদন-গভীর দু আঁখি পেতে।
দেখিলে গহন জ্ঞান-বৈভব, সমাহিত সাধু বোধির লাগি,
দিব্য-নয়নে ভাবী ভারতেরে লভিলে ধেয়ানে হে বৈরাগী।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নব মন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা।
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

সন্ন্যাসী পরিব্রাজক মানুষে অন্তরে তুমি নিয়েছ চিনে,
মরমী ও চির-ব্যথিত হিয়ায় ঠাঁই পায় তাই ধনী ও দীনে।
আত্মা মাগিছে আত্মায়, নিলে আত্মীয় বলে সবায় টানি,
আশাহত ভীরু দুর্গতে দিলে বেদ-নিঃসৃত বহ্নি-বাণী।
পশ্চিমে তাই প্রাচ্য তাপস মুক্ত করিলে পূর্বদ্বার,
নবারুণ-আলো চেতনায় জ্বলে সঞ্চিত যুগ-অন্ধকার।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নব মন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা,
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

আচার্য, তুমি শিখালে মন্ত্র, জীবে পূজে যেই পূজে সে শিবে,
ফিরে চাওয়া নয়, শুধু দেওয়া ঢালি, ফিরে পাবে তত যতই দিবে।
হৃদয়-কুসুম ফুটায়ে যতনে শুধু তুলে ধরা অর্ঘ্য-ডালি,
বীর্যে-বিভবে মধু-সৌরভে শুধু তোলা ধীরে আপনা জ্বালি।
হে চির-উদাসী বীর সন্ন্যাসী, এ যুগ-মানসে যা দিলে ভরি
অক্ষয় সেই মহাসম্পদে পারি যেন নিতে জীবনে বরি।
হে দেব, দিয়েছ মহাজীবনের যে নব মন্ত্র হৃদয়ে গাঁথা,
জাগ্রত ওই উদার নিখিল শ্রীচরণতলে রেখেছে মাথা।

LIBRARY
No. 11/290
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

হায়দ্রাবাদ—১৮৯৩

"বিশ্ববাসী যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের সহিত তাহাদের একীভূত সত্তা উপলব্ধি করিবে সে পর্যন্ত আমি তাহাদের অনুপ্রাণিত করিতে ক্ষান্ত হইব না।"

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

স্বামীজী-প্রসঙ্গ ও ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি

শ্রীফণিভূষণ বসু

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহামানব। তাঁর তিরোভাবের পর প্রায় ষাট বৎসর অতীত হয়ে গেল কিন্তু এখনও যে তাঁর গৌরব-বিভা অম্লান শুধু তাই নয় বরং দিনের পর দিন যেন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। মনে হয় তাঁর মহাপ্রয়াণের সময় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম-সংবলিত মাত্র তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বেলুড়, বারাণসী ও আলমোড়ায়—কিন্তু আজ শুধু বাংলা বা ভারতে নয় পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সম্প্রতি গ্রীসের রাজা ও রানী যখন বেলুড় মঠ দর্শনে গিয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁরা আশ্রমীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে বর্তমানে কতগুলি রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর পেয়ে এবং গ্রীসের রাজধানী এথেন্স সহরেও একটি রামকৃষ্ণ মিশন আছে জানতে পেরে তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আজ দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য বিবেকানন্দ-জয়ন্তীর সংবাদে পূর্ণ। এর কারণ কি এবং এর প্রেরণা কোথায় তা বুঝে দেখবার সময় এসেছে।

অস্ত্রের সাহায্যে ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে ধর্মান্তর গ্রহণের নিদর্শনও বড় কম দেখা যায় না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের মূলে ভিন্নশক্তি ক্রিয়া করেছে; তাঁর সমর-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবুও তাঁর ধর্মমতের এত প্রসার-বৃদ্ধির কারণ কি? কারণ মনে হয় স্বামীজী ও তদীয় গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ধর্মের ব্যাখ্যা ছিল সরল, সুবোধ্য কিন্তু সতেজ। তাতে ধর্মান্ধতা বা ধর্মবিদ্বেষের পূতিগন্ধ ছিল না; ছিল কেবল অফুরন্ত আকর্ষণ। তাই আজ তাঁর জন্মজয়ন্তীর দিনে সারা বিশ্বে এক বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে।

দেশ, সমাজ এবং ধর্মের উপর স্বামীজীর প্রভাব ঠিক ভাবে বুঝতে হলে তাঁর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন দেশ, সমাজ ও ধর্মীয় অবস্থার পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার প্রয়োজন। সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরাজ ভারতে তার সাম্রাজ্য নিরঙ্কুশ করেছে বটে, তখন কিন্তু কায়েম করার কাজ রয়েছে বাকী। সে দিনে বিদেশী শাসকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন। রাজ্য শাসন কেবল ঐ উদ্দেশ্যের সহায়ক মাত্র। তাই "বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে।" শাসন ও শোষণ একসঙ্গে চালু করে ভারতের আদর্শ, ভারতের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি ভারতের ধর্ম ধ্বংস করে তারই চিতাভস্মের উপর সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার প্রাধান্য। দেশের অবস্থা এমনি সঙ্গিন যে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত আপামর সাধারণ ইংরাজের মোহে আবিষ্ট। উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য ইংরাজ তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল তিনটি ধারায়।

ব্যবসায়ী ইংরাজ খুলতে আরম্ভ করে দিল সওদাগরী অফিস এবং তাতে নিয়োগ করল অল্প অল্প ইংরাজী জানা লোক। এক একটা অনুগতের দলের সৃষ্টি হতে লাগল এবং তাদের বৈভব দেশের লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়ে দিল।

ধনীর সন্তান ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাভ তখন একরকম অসম্ভব ছিল। চতুর ইংরাজ তাদের জন্য খুলে দিল কলকাতার হিন্দু কলেজ এবং এই কলেজই তখন ধনীর সন্তানদের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠল। শিক্ষক ছিলেন লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক এবং স্বাধীন চিন্তার উপাসক। তাঁর আদর্শ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে স্বাধীন চিন্তার পথে ছাত্রসমাজ দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক হয়ে উঠল।

এদিকে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করে দিল উইলিয়াম কেরী, জন্ ক্লার্ক মার্সম্যান, রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনারীর দল। তাঁরা যে কেবল খৃষ্টধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকলেন তা নয়, অনেক জনকল্যাণকর কার্যেও তাঁরা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে অশিক্ষিত এবং অভাবগ্রস্ত লোক দলে দলে এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের ভিত্তি শিথিল করে দিতে লাগল।

এই ত্রিমুখী প্রবাহের মধ্যে পড়ে দেশ ও সমাজ এক সঙ্গিন অবস্থার সম্মুখীন হল। দেশের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন যে শিক্ষিত যুবকের দল সেদিন এমনই উচ্ছৃঙ্খল যে ধর্মের প্রত্যেক বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করাই যেন তারা পুরুষকারের নিদর্শন বলে ধারণা করে নিল। গোলদীঘির এক প্রান্তে তখন হিন্দু কলেজ এবং অপর প্রান্তে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর এক মুসলমানের হোটেল। সেখানে হিন্দুর অখাদ্য গোমাংস-সংবলিত খাবার সর্বদাই বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকত। টিফিনের ছুটির সময় অনেক ছাত্রই অশোভন আগ্রহে স্কোয়ারের রেলিং টপকে অপর প্রান্তে রাস্তার পাশের হোটেলে ঐ নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করত। যার পয়সা থাকত সে কিনত, আর যার থাকত না সে চেয়ে খেত, যার ভাগ্যে তাও ঘটত না সে অপরের হাত বা উচ্ছিষ্ট পাতা আস্বাদন করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিত।

কালাপানি পার হওয়ার বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধের এখন আর কোন বালাই নেই। শিক্ষিত ধনীর সন্তানগণ ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী বা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দলে দলে বিলাত যেতে আরম্ভ করেছে। ফিরছে একদম সাহেব হয়ে। ধর্ম তাদের কাছে কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র। সাহেবীভাবে চলাফেরা এখন আর দোষাবহ ত নয়ই বরং এটা এখন আভিজাত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য হতে লাগল।

জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) প্রথম বৈঠক হয় বোম্বাই সহরে। তার সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এদেশে ইনিই সর্বপ্রথম স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নাম স্বাক্ষর করতেন W. C. Bonerji বলে। হাই কোর্ট-এর লম্বা ছুটির সময়ে অন্যান্য সাহেব ব্যারিষ্টার বা জজদের মতন তিনিও 'হোমে' অর্থাৎ বিলাতে যেতেন। বিলাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তা বলে তাঁর স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তা বোধের যে অভাব ছিল সে কথা মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। কারণ তখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ছিলেন বাংলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ পার্শী দাদাভাই নওরোজী, স্যার ফিরোজশা মেটা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ কর্মী ও ব্যবহারজীবী আনন্দ চার্লু প্রভৃতি। তাঁরা যে একজন দেশাত্মবোধহীন ব্যক্তিকে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি পদে বরণ করে নিয়েছিলেন এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক হবে। সাহেবী খানা সেদিনে অপাঙক্তেয় ত ছিলই না—বরং ঐটাই সভ্যতা-সংগত বলে গণ্য হত। দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে দেখে রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নূতন ধর্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর পদানুসরণ করে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্মের দিকে শিক্ষিত সমাজের মন আকৃষ্ট করতে আরম্ভ করে দিলেন। ফল যে কিছু হয়নি তা নয়। খৃষ্টধর্মের প্রতি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রীতির জোয়ার এসেছিল কথঞ্চিৎ পরিমাণে তা প্রশমিত হল বটে—কিন্তু তাঁদের প্রচারিত ধর্মমত সহজবোধ্য ছিল না বলে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। আরও বিদেশী শাসন দেশের আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর যে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে তাকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল তাঁদের ধর্মমত তাকেও সতেজ করে তুলতে পারল না।

ঠিক এমনই সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর বাণী ঘোষণা করলেন, "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী";

দেশ সচকিত হয়ে উঠল। ভারতের আদর্শ তাও একটা আছে নাকি? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এ সমস্ত কি বাস্তব চরিত্র? তবে কি রামায়ণ, মহাভারত উপন্যাস নয়? উদ্‌ভ্রান্ত দেশ যখন সবেমাত্র আত্মস্থ হতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়ে ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকার চিকাগো সহরে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি রূপে স্বামী বিবেকানন্দ তাতে যোগদান করেন। বহু বাধা সত্ত্বেও সহায়সম্পদহীন অবস্থায় কেবলমাত্র অদম্য উৎসাহ আর অটুট আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে এক বদান্য মহিলার সাহায্যে ধর্মমহাসভায় বক্তৃতাদানের অনুমতি লাভ করেন। তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতায় মহাসভার অন্যান্য প্রতিনিধিরা চমৎকৃত হন এবং আমেরিকাবাসীরা মুগ্ধ হয়ে যায়। মিঃ স্যাণ্ডস্‌বার্গ ও মাদাম লুই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডে এলে মিস্ মার্গারেট তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলিকাতায় চলে আসেন এবং ভগিনী নিবেদিতা নামে সাধারণের নিকট পরিচিতা হন। এর প্রতিক্রিয়া এদেশে বড় কম হল না। দেশ সেদিন বুঝল ভারতের ধর্ম, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের আদর্শ অন্য সভ্য দেশেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম। তন্দ্রাতুর ভাব কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ আবার সচেতন হয়ে উঠল। যে প্রতিকূল স্রোত এতদ্দিন ভারতকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তার শক্তি স্থির হয়ে গেল। একথা অনস্বীকার্য যে এই প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। গুরু-শিষ্যের মিলনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী আজ মহাতীর্থে পরিণত হল। সারা ভারত মুখরিত হয়ে উঠল তাঁর জয়গানে, "তুমি ধন্য ধন্য হে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে দেশের মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে না পারলে সমাজের উন্নতি করা সম্ভব হবে না, আর সমাজ সুগঠিত না হলে ধর্মের ভিত্তিও দৃঢ় করা যাবে না। তাই সবার ওপর তিনি মানুষের স্থান দিয়েছিলেন এবং জীব ও শিবকে একই আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নিজেরই উক্তি:

বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

উপরোক্ত উক্তির সমর্থনে প্রসঙ্গক্রমে আমার ছাত্রজীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারি না। তখন আমি স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। রোগশয্যায় শায়িত এক বন্ধুকে দেখবার জন্য আমি ও আমার সহধ্যায়ী বিপিনবিহারী দে বাগবাজার অঞ্চলে যাই (বন্ধুবর বিপিনবিহারী ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; তিনি আজ পরলোকে।) বাগবাজার বোসপাড়া দিয়ে ফিরবার সময় খেয়াল হল যে, ভগিনী নিবেদিতাকে একবার দর্শন করে যাই। তাঁর আবাসভবনের দিকে অগ্রসর হতেই ভদ্রবেশী এক ব্যক্তি এসে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন দুই তরুণ কলেজীয় যুবককে। সেটা ছিল বাংলার অগ্নিযুগ। বিপ্লবীদের হাতে তখন অনেক রাজপুরুষ ও পুলিশের লোক প্রাণ দিয়েছে। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে ভগিনী নিবেদিতার উপর পুলিশের ধারণা বড় ভাল ছিল না। পশ্চাতে ফিরতেই যখন ভদ্রলোক নোটবই বার করে কি যেন লিখতে আরম্ভ করলেন তখন বুঝলাম উনি পুলিশের গোয়েন্দা। ভিতরে প্রবেশ করতেই অন্য একটি ভদ্রলোক আমাদের পরিচয় ও সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞাসা করে বললেন যে আপনারা বড় অসময়ে এসেছেন। এখনই ভগিনী নিবেদিতার কয়েকজন মাদ্রাজী অনুরক্ত আসবেন বিশেষ প্রয়োজনে। পূর্ব হতেই সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করে আসি, দেখি কি বলেন। উত্তরে জানালাম আমরা কেবল মাত্র দর্শনপ্রার্থী। আলাপ আলোচনার সময় না পেলেও আমরা দুঃখিত নই। অনুমতি নিয়ে এসে তিনি আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। অবনতমস্তকে অভিবাদন জানাবার পর তিনি আমাদের বসবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর সৌম্য মূর্তি দর্শনে আমরা এমন মুগ্ধ হয়ে গেছি যে কি যে বলব তা যেন ঠিক

করতে পারছি না। তিনিই সহাস্যবদনে প্রথমে আলাপ আরম্ভ করলেন এবং আমরা যে কলেজের ছাত্র সে পরিচয় পেয়ে যেন একটু আনন্দ বোধ করলেন। এইবার এল প্রশ্ন-উত্তরের পালা।

শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবার জন্য আপনাদের কি কোন কায়িক পরিশ্রম করতে হয়?

না, ব্যয়ভার আমাদের অভিভাবকগণ বহন করেন।

অবসর সময় কি কোন জনহিতকর কার্যে ব্যয় করেন?

হাঁ, কলেজের স্কুল-বিভাগের বাড়ীতে একটা নৈশ-বিদ্যালয় আছে, তাতে আমরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতার কাজ করি।

কতক্ষণ পড়ান এবং ব্যয়ভার বহন করে কে?

সপ্তাহে তিন ঘণ্টা পড়াই আমরা এবং তার ব্যয়ভার বহন করেন কলেজের অধ্যক্ষ।

সময় যা ব্যয় করেন তা পর্যাপ্ত না হলেও কিছু করেন যে এটাই ভাল। তাতে পড়ে কারা?

গ্রে ষ্ট্রীটে কলকাতা করপোরেশনের যে কুলী-মেথরদের কোয়ার্টার আছে তার বাসিন্দাদের অনেকে; দুই এক জন বর্ষীয়ান লোকও পড়তে আসে।

যাদের পড়ান তাদের কি নিজের ভাইএর মতন বুকের কাছে টেনে এনে পড়ান, না কেবল অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষাদান করেন?

এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। যদি বলি হাঁ, তাহলে সত্যের অপলাপ করা হয়; আর যদি বলি না তাহলে আমাদের সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেওয়া হয়। আমাদের নীরব থাকতে দেখে তিনি বোধ হয় প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই বললেন, গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ এই যে শিক্ষার ফলে আত্মপ্রত্যয় আসে; আর আত্মপ্রত্যয়ের ফলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠেন। কিন্তু শিক্ষা দিতে হবে যাকে তাকে সবার আগে প্রকৃত মানুষ বলে মনে করে কার্যে ব্রতী হতে হবে। অন্যথায় সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে। আর কিছু বলবার পূর্বেই তাঁর মাদ্রাজী অনুরক্তের দল এসে উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্মিতহাস্যে আমাদের বিদায় জানালেন এবং আমরাও নতমস্তকে পুনরভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের মনের অবস্থার কেমন যেন একটা কি পরিবর্তন হয়ে গেল। আমরা তখন প্রায় অভিভূতের মতন। শ্যামপুকুরের মোড়ে বন্ধুবরকে ট্রামে তুলে দেবার জন্য চলতে লাগলাম। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সময় আমরা প্রায় নির্বাক হয়েই সময় অতিবাহিত করেছি। বহু দিন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে দিনের সেই স্মৃতি আজও অম্লান এবং যতই দিন যাচ্ছে সে উপদেশের গুরুত্ব ততই যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমত ও ধর্মসাধনায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি ধর্মকে ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা বা কৃচ্ছ্রসাধনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন নি কোন দিনই, বা নিষ্ক্রিয় সাধনার দ্বারা আত্মসিদ্ধির জন্যও যে নিবিষ্টভাবে ব্যাকুল ছিলেন তাও মনে হয় না। তিনি ছিলেন কর্মবাদী এবং কর্মবীর। তাঁর ধর্মের পরিধি ছিল বিস্তৃত কিন্তু তার কেন্দ্র ছিল মানুষ। তাঁর সাধনায় দেবতাকে তিনি আবদ্ধ করে রাখেন নি কোন দিনই মন্দিরের অভ্যন্তরে; তাই আজ তাঁর জন্ম-জয়ন্তীর দিনে এমন অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছে দেশ-দেশান্তরে। আজ তাঁর কম্বুকণ্ঠ নীরব, তবুও যেন ভারতের আকাশ বাতাসকে প্রতিধ্বনিত করে আসছে তাঁর আকুল আহ্বান—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ"; এবং মনে হয় তাই তাঁর জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিরাট এক আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর দল রামকৃষ্ণ মিশনকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাবধারাকে মানবের মনোরাজ্যে অমর করে রাখার জন্য জীবনোৎসর্গে ব্রতী হয়েছেন, আর প্রেরণা লাভ করছেন যেন দিনের পর দিন তাঁরই শক্তিমন্ত্রে "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

BANARAS
11/290 শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

‘আমি অশরীরী বাণী’

ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ

‘আমি অশরীরী বাণী’—কথাটি আনকোরা নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ। কে এই আমি? কেনই বা তিনি অশরীরী? আর কি-ই বা তাঁর বাণী? এই ত্রিবিধ প্রশ্নের উত্তর আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবন নাটকের আলোকপাতে দেখতে চেষ্টা করব। প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছিল কতকগুলি আপ্তবাক্য: যেমন ঋগ্বেদে—‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ (ঐঃ উপঃ), যজুর্বেদে—‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (বৃঃ উপঃ), সামবেদে—‘তত্ত্বমসি’ (ছাঃ উপঃ) এবং অথর্ববেদে—‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (মাঃ উপঃ)। বহুযুগ পরে উনবিংশ শতকের নরঋষি স্বামী বিবেকানন্দের মুখে আমরা শুনলাম, বৈদিক ধাঁচের মহাবাক্য: ‘আমি অশরীরী বাণী’, ‘আমি জগতের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা’।

কে এই আমি?—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষের পক্ষে এই বিরাট পাকা-আমিরূপী স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝা অসম্ভব। তাঁর সমস্ত জীবন ছিল ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য অনুভূতির দ্বারা ভরপুর; আর তাঁর বাণী আত্মার মর্মবাণী। তাই স্বামী বিবেকানন্দের আমিকে বুঝতে গেলে হয় আমাদের এই বিষয়াসক্ত মনকে কমপক্ষে কয়েক ধাপ উপরে টেনে তুলতে হবে নতুবা কোন অনুভূতিবান পুরুষের মুখ থেকে জেনে নিতে হবে কে এই অলোকসামান্য মহাপুরুষ।

প্রথমে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনব কে এই নরেন্দ্রনাথ? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে বলতেন: ‘নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ, মহাপুরুষ। নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা।’ কখনও বলতেন, ‘নররূপী নারায়ণ; জগৎ-কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ।’ জহুরিই জহর চেনে। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই ঠিক ঠিক চিনেছিলেন স্বামীজীকে। তাই আমরা দেখি, পরবর্তীকালে স্বামীজীর ভিতর তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি উৎসারিত করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি।’

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর রসঘন নাটকীয় ভঙ্গীতে স্বামীজীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন: ‘নরেনকে বাঁধতে গিয়ে স্বয়ং মহামায়া বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি যত নরেনকে বাঁধতে যান, সে তত বড় হয়ে যায়, ফলে মহামায়ার দড়ি আর কুলায় না।’

আর একটা ছোট সুন্দর ঘটনার অবতারণা করছি। বেলুড়মঠ তখন সবে প্রস্তুত হয়েছে। সাধু নাগমহাশয় স্বামীজীর সঙ্গে মঠে দেখা করতে এসেছেন। স্বামীজীকে দেখে সেই অনুভূতিবান আদর্শগৃহীর কি সুন্দর অভিব্যক্তি: ‘আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শংকর! জয় শংকর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল।’ এই সেই বাল্যের বীরেশ্বর (বিলে) আর পরবর্তীকালের বিরাট আমিরূপী বিবেকানন্দের স্বরূপ।

স্বামীজীর গুরুভাইরা স্বামীজীকে দেখতেন তাঁদের প্রিয়তম গুরুরই প্রতিনিধিরূপে। পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, “স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, ‘তোমরা আগে আমাকে বোঝ, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝার চেষ্টা করবে।’ দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একজন সম্পূর্ণ মানব (Perfect Man)। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব?”

হিমালয়ে প্রব্রজ্যাকালে একজন মুসলমান স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন, ‘স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলে দাবী করেন, স্মরণ রাখবেন যে, আমি মুসলমান হয়েও তাঁদের সকলের

অগ্রণী।' পাশ্চাত্যের বহু মনীষীও স্বামীজীর আমিকে বুঝতে গিয়ে বলেছেন, 'ইনি কোনো বিরাট সত্তার অবতার —হয়তো বুদ্ধের—হয়তো খ্রীষ্টের!'

সূর্য যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, সেইরূপ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিই নিজের স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করে থাকেন। স্বামীজী জানতেন, তিনি কে। এমনকি তিনি তাঁর পূর্বজন্মের বিষয় অবগত ছিলেন। আমেরিকায় একদিন 'পুনর্জন্মবাদ'-এর উপর বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন, 'আমি বাল্যাবধিই আমার পূর্বজন্মের বিষয় অবগত আছি। আমেরিকায় আর এক বক্তৃতায় অনুভূতির চরমতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বুকে হাত দিয়ে সজোরে বলেছিলেন, 'I am God'। এই বক্তৃতায় অনেকে বুঝেছিলেন যে স্বামীজী কি এক গুরুতর কথা বলে ফেলেছেন। স্বামীজী ধরা পড়েছেন তাঁর নিজের কথায়। কতবারই না তিনি বলেছেন: বুদ্ধ খ্রীষ্টের ন্যায় আমিও সেই অনন্ত সোঽহং (ব্রহ্ম) সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র।

স্বামীজীর এইসব স্বকথিত আত্মপরিচয়ে গোঁড়া ব্যক্তি হয়ত মনে করবেন—এ বুঝি বিধর্মীসূচক বাক্য, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি হয়ত মনে করবেন, এ বুঝি দম্ভোক্তি। এ প্রশ্নের উত্তর বহু বছর আগে এক মনীষী ব্যক্তি তাঁর আটপৌরে ভাষায় দিয়ে গিয়েছেন: বিবেকানন্দের কর্মে ও চিন্তায় যদি কিছু আধ্যাত্মিকতা থাকে, তবে তা এই 'অহংকারের' মধ্যে ঢুঁড়তে হবে। অহংকারের এই দম্ভল যে জীবনে নাই সেই জীবনে বিবেকানন্দ প্রবেশ করেন নাই। অহংকারের এই দম্ভলে যে জীবন চাঙ্গা হয়েছে সেই জীবনই বিবেকানন্দের লীলাক্ষেত্র। লোকে বলবে, 'আরে ভায়া, এই ব্যক্তিস্বনিষ্ঠা, এই পুরুষকার, এই পৌরুষপ্রতিষ্ঠা, এই আত্মগৌরব, এই আত্মচৈতন্য, এই আত্মকর্তৃত্ব, এই অহংকার—এ সবই যে বেদান্ত।' বিবেকানন্দ উত্তর দিবেন: 'আরে বেদান্ত আর আমি কি আলাদা?'

শরীর যাওয়ার আগে বেলুড়মঠে স্বামীজী বলেছিলেন, *'আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝত এ বিবেকানন্দ কি করে গেল।'* তাই স্বামীজীর আমিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কত বড় অসম্ভব ব্যাপার! তবুও আমরা এই মহাজীবনের উপর শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করব, কারণ পরশমণির স্পর্শে আমরা সোনা হব।

কেন তিনি অশরীরী?—জীবন্মুক্ত পুরুষদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন থাকে না। তাঁদের ভূমা-আমি প্রতিষ্ঠিত থাকে 'স্বে মহিম্নি'তে (স্বমহিমায়) অর্থাৎ আত্মায়। এইসব আত্মক্রীড় আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষেরা জগতের পতিত, দুর্বল, পদদলিত, দরিদ্র, ব্যথিতদের পরিত্রাতা বা ভেলা-স্বরূপ হয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।' যিনি প্রতি মুহূর্তে জানেন আমি সেই 'আত্মা—অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোক, সত্যকাম সত্যসংকল্প' ইত্যাদি, তাঁর কাছে আর কোন জাগতিক বন্ধন থাকে না। শাস্ত্র বলেন, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।

এইরূপ সমত্বদর্শনের অভিজ্ঞতা বা বেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্বিকল্প সমাধি স্বামীজী কাশীপুর বাগানবাড়ীতে লাভ করেছিলেন। সেই তেজীয়ান বুদ্ধিমান যুবক নরেন্দ্রনাথ, বিকারের ঘোরে উন্মত্ত প্রলাপী রোগীর মত আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলেন, 'গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল? আমি হাত-পা খুঁজে পাচ্ছি না।' ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের পক্ষে এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু রূপ-কথার গল্প বলেই মনে হবে। শরীর আছে অথচ শরীর আছে কিনা বোধ নেই—এ-হেন দৃষ্টান্ত স্বামীজীর জীবনে বহুবার দেখা গেছে। আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানের এক ক্লাসে কয়েকজন অন্তরঙ্গদের স্বামীজী বলেছিলেন, 'এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা রয়েছে—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর। সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা—যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দরূপে দর্শন করছি—তাঁর কখন জন্ম হয়নি; তিনি কখনও মরবেন না—তিনি অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।'

আমেরিকায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর শরীর ভেঙ্গে যায়। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে ঢাকাতে কথোপকথনচ্ছলে এক ভদ্রলোক স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'স্বামীজী, আপনার শরীর এত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেল, আগে থেকে যত্ন নেন-

নি কেন?' স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'আমেরিকায় আমার শরীরবোধই ছিল না।' জগতের দুঃখে স্বামীজীর অন্তরাত্মা কাঁদত। তিনি একখানি চিঠিতে ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'The Spirit is willing but the flesh is weak.' পাশ্চাত্যের এক শিষ্যকে লিখেছিলেন, 'আমার মুখ হতে যাই বের হোক না কেন, কিছুতেই ভয় পেয়ো না। কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়, তা স্বয়ং প্রভু।'

স্বামীজী নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আগত একজন পুরুষ বলে অনুভব করতেন। সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর সুন্দর হৃদয়গ্রাহী স্মৃতিকথায় লিখেছেন: সত্তর বছর বয়স্ক কোন ব্যক্তির সামনে ত্রিশ বছর বয়স্ক স্বামীজীকে মনে হোত তিনি কত প্রাচীন! তিনি ছিলেন সর্বকালের জ্ঞানের প্রতিভূ। তিনি কখন কখন বলতেন, 'আমি নিজেকে তিনশ বছরের বৃদ্ধ বলে অনুভব করছি।' লণ্ডনে একদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমেরিকাতে আমাকে বলত, আমি যেন পাঁচ হাজার বছর আগের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হতে এসে বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি।' এইরূপ বিভিন্ন কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমরা স্বামীজীর বিদেহীভাবের পরিচয় পেয়ে থাকি।

আর কি-ই বা তাঁর বাণী?—এ জগতে সত্যসংকল্প মহাপুরুষদের বাণী, এমনকি চিন্তা পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। ইহাদের বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; ফলে তাঁদের বাণীতে ফুটে উঠে এক অদৃশ্য দুর্বার শক্তি। এই আত্মিক শক্তির কাছে সব ভেসে যায়। স্বামীজী এই শক্তি অনুভব করতেন। পরিব্রাজক জীবনে বরোদায় তিনি তাঁর এক গুরুভাইকে বলেছিলেন, 'আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করছি। মনে হয়, আমি বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ব। আমার মধ্যে এত শক্তি আছে যে আমার মনে হয়, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাতে পারি।' স্বামীজীর বাণীর পশ্চাতে ছিল এই শক্তি। আমেরিকায় স্বামীজীকে প্রচার করা হত: 'বক্তৃতামঞ্চে অন্যতম মানব' 'দেবদত্ত শক্তিতে শক্তিমান বাগ্মী', 'ইনি বিশ্বমেলা সম্মেলনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন', 'সাইক্লোনিক হিন্দু', 'বৈদ্যুতিক বাগ্মী' ইত্যাদি। এত সব প্রশস্তির একটি কথাতে স্বামীজী জবাব দিয়েছেন—'মূকং করোতি বাচালম্' অর্থাৎ কিনা মূলতঃ এ সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী লীলা!

শাস্ত্রে আমরা পড়ি—অন্নময়ং মন, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্। স্বামীজীর ঐ তেজোময়ী বাকের পশ্চাতে ছিল তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য, অমানুষিক তপস্যা এবং সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার ফলে তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন বা অধিগত জ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে মনে করতেন, তখনই—এমনকি ঘুমন্ত অবস্থাতেও—তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পরবর্তীদিনের বক্তব্য বিষয় পেয়ে যেতেন এবং দৈববলে বলীয়ান হয়ে বক্তৃতামঞ্চে উঠতেন। মনীষী রোলাঁ তাঁর মনোজ্ঞ ভাষায় বলেছেন, 'চিকাগোতে তাঁর ভাষণ ছিল যেন লেলিহান অগ্নিশিখা। নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরিয়ে দিল।' তাঁর শক্তি মানুষকে প্রচণ্ডভাবে অভিভূত করে ফেলত। এমা কালভে বলতেন, 'স্বামীজীর গলার স্বর ছিল চীনাগঙের আওয়াজের মতো, আর তা কর্ণভেদ করে মানুষের আত্মা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিত।'

স্বামীজীর কথাগুলি ছিল বাস্তবে ভরা এবং তা অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তুলত। স্বামীজী একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন, 'তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু লেকচার দিই? I know, I give them something solid. They know that they receive something solid'. উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে দুটি ছোট ঘটনার অবতারণা করব।

পাশ্চাত্যে বহুলোক স্বামীজীকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করতে আসত। যারা দুষ্ট মতলব নিয়ে আসত তারা স্বামীজীর কথা শুনে ভয়ে পালিয়ে যেত; আর যারা ভাল তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত বা বন্ধু হয়ে যেত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে স্বামীজী ক্লাস শুরু

করেন। ওখানকার গৃহকর্ত্রী ছিলেন একজন গোঁড়া মেথডিষ্ট ক্রীশ্চিয়ান, নাম মিস ডাচার। স্বামীজীর কাছে আত্মার মহিমা শুনে এবং জ্বালাময়ী ঐশীশক্তির প্রভাব দেখে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। কথাপ্রসঙ্গে অপরদের স্বামীজী বলেছিলেন, 'তোমরা লক্ষ্য করছ না এটা স্বাভাবিক অসুস্থতা নয়? তার (মিস্ ডাচারের) মনোরাজ্যে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে—এটা তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ। সে সহ্য করতে পারছে না।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে স্বামি-শিষ্য-সংবাদে। বেলুড় মঠে একটা আমগাছের নীচে বসে আছেন স্বামীজী। শিষ্যকে (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) উপস্থিত সাধুব্রহ্মচারীদের দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিস্নে?—এই—এই!'

এমন হৃদয়স্পর্শীভাবে স্বামীজী কথাগুলি বললেন যে, শুনেই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'!—গভীর ধ্যানে মগ্ন। কারও মুখে কথা নেই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হতে কমণ্ডলু করে জল নিয়ে ঠাকুর-ঘরে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেও স্বামীজী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম!' বলতে লাগলেন। ঐ কথা শুনে তাঁরও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হয়ে রইলো; একটা মহানেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। এইরূপে প্রায় পনের মিনিট গত হলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করে বললেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতন হয়। কি তেজোময়ী বাক্!

আজকাল স্বামীজীর বাণীর গভীরতা এবং ব্যাপকতা নিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের মনে আলোড়ন জেগেছে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'তাঁর শ্রীমুখ হতে এই আধুনিক জগতে সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারিত হচ্ছে—ত্যাগ, মুক্তিপিপাসা, বন্ধনক্ষয়, অগ্নিবৎ পবিত্রতা, সাক্ষিস্বরূপ হওয়ার আনন্দ, সাকারকে নিরাকারে লয়করণ ইত্যাদি।' এ জগতে যাঁর কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাঁকেই বার্তাবহ বা দূত বলা যেতে পারে। যেমন সেণ্ট পল ছিলেন যীশুখ্রীষ্টের বার্তাবহ, তেমনি স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। কতবারই না স্বামীজী বলেছেন I have come with a mission; স্বামীজীর এই মিশন 'কালে কত বিবেকানন্দ জন্মাবে'—তারাই বুঝবে আর এর ভাবপ্রবাহ যুগযুগ ধরে অব্যাহত থাকবে। শরীরত্যাগের কিছুকাল আগে জগতের দুঃখে ব্যথিত হয়ে অভয়দান করে স্বামীজী বলেছিলেন, 'হয়ত আমি আর এ শরীরে থাকব না—জীর্ণবস্ত্রের মত একে ছেড়ে ফেলে দেব। কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষকে আমি প্রেরণা জুগিয়ে যাব—যতদিন পর্যন্ত না তারা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন এ-কথা ঠিক ঠিক জানতে পারে।'

শুধু এইজন্যই তো সর্বকালের সর্বমানবের কাছে চির-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে রয়েছে এবং থাকবে স্বামীজীর অশরীরী প্রাণস্পর্শী বাণী। স্বামীজীর কাছে তাই প্রার্থনা, যেন তাঁর অযুত অনলস্রাবী বাণীর ভিতর থেকে দুটি ছোট বাণী আমাদের দু-কানে অহরহ বাজতে থাকে: 'মানুষ হও' আর 'এগিয়ে যাও'।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

বিবেক-বাণী

শ্রীবিমল দত্ত

একটি বাণীর ঝড়, একটি ভাবের বন্যা,
একটি যজ্ঞাগ্নি লেলিহান
অম্বর-চুম্বিত এক অভীপ্সা মহান্
হে বিবেক, এই তব দান :
সে-ঝড় থামেনি আজো, সে-বন্যা আজিও বহমান,
সে-যজ্ঞাগ্নি চারু গন্ধে পৃথিবী পূরিল সবখান,
পবিত্র সঙ্গীতস্পন্দে কম্পিত বিমান।
প্রাণে প্রাণে রুদ্রদোল, জড়ে লাগে চেতনার টান,
মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারে শিখা কম্পমান
প্রদীপ্ত, ভাস্বর হয়, জয়ী হয়, জাগে মহীয়ান :
জীবাত্মা নির্মোক ছেড়ে উর্ধ্বায়িত প্রাণ
হয় ভগবান।
একটি বিমুগ্ধ আত্মা—ভালবাসা, প্রেম সর্ব্বজয়ী
উষ্ণ আলিঙ্গন যাচে আচণ্ডাল মানুষের কাছে—
অগ্নি হয়ে জ্বলে ওঠো, নিষ্পাপ পবিত্র হও সবে,
অণু হও মহীয়ান, আত্মা মধ্যে সুচির-বিরহী
ভগবান বাস করে—চিনে নাও, চিনে নাও তারে।
নির্মোক খসিয়া যাবে, দেখা পাবে
ষড়ৈশ্বর্যময়ী
সেই মাতা—এই মাটি মৃত্তিকার এই সে স্বদেশ,
অসংখ্য মানুষ সব—সব তাঁরই
আপন সন্তান।
ভালোবেসে মুক্তি পাও—
কর্মপাক খুলে যাক্ যাক্ :
বিবেক, তোমার বাণী
অমৃতের মধুভরা চাক।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার নবজাগরণ

শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ ঘটেছে, তা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। নবজাগরণের মধ্যে যে সর্বাত্মক মুক্তিপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তার প্রকাশ শতাব্দীমধ্যে সম্যকভাবে যদিও বা ঘটেনি, তথাপি জাতির মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন যে এই সময়েই সূচিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মান্দোলন, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, জাতির আত্ম-সম্বিৎ উপলব্ধি, শিক্ষার অগ্রগতি, সমাজসচেতনতা, রাষ্ট্রিক অধিকারবোধ—এক কথায় জাতির মনন ও চিন্তনের সর্বাত্মক প্রয়াসের মধ্যে নবজাগরণের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর ভাব-প্লাবনের পর জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এত বড় ভাবের বন্যা আর আসেনি। আর ষোড়শ শতাব্দীর আবহাওয়া ছিল মূলতঃ বৈষ্ণবতাযুক্ত। মানবপ্রেমের উদারবাণী সামাজিক ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হলেও পরবর্তীকালের শাসন-নিগড়ে তা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। সেদিক দিয়ে উনবিংশের ভাবাবহ অনেকখানি সুদূরপ্রসারী। এক-সঙ্গে এতগুলি মনীষীর আবির্ভাব আর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জাতীয় উন্নতির সমবেত চেষ্টা নিঃসন্দেহে নব-জীবনের সূচনা করছে। ইতিহাসের ধারায় লক্ষ্য রেখে বলা যায় এই যুগের চিন্তাধারাতেই আধুনিক ভারত গড়ে উঠেছে। আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, এর পরেই আত্মোপলব্ধি। উনবিংশ শতাব্দীতে যদি আমাদের আত্ম-শুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে বিংশ শতাব্দীতে আমরা স্বশক্তিতে আস্থাবান হতে চেয়েছি। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা নতুন দেশ ও সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়েছি। রাষ্ট্রিক শাসনমুক্তি আর দাসত্বশৃঙ্খল-মোচনের মধ্যে আমরা মুক্তিযজ্ঞের ব্রত উদ্‌যাপন করেছি।

কিন্তু আমাদের দেশে নবজাগরণের ক্রমটি এত বিসর্পিল যে, এর মধ্যে জাতীয় ভাবধারা কোথায় ঠিকমত বিকসিত হবার সুযোগ পেয়েছে, তা চিন্তা করতে হয়। জোয়ারের প্লাবন অনেক সময় তীর-তট উপছে পড়ে, হয়ত কিছু পলিমাটিরও সঞ্চার করে ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা তীর-তটের ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়েও যায়। সেইরূপ, উনবিংশের ভাবাবহ অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর উর্বরতা নিয়েও ভাঙার কাজ করেছে, জাহ্নবীধারার কল্যাণচিহ্ন সর্বদা লক্ষিত হয়নি। তবে পরবর্তীকালে জাতীয় ভাণ্ডারে আহৃত চিন্তা-উপকরণগুলি মোটামুটি কাজে লেগেছে। হয়ত ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে এই বেগবান চিন্তাগুলি অনেক বেশী কার্যকরী হত। এক্ষেত্রেই আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করতে হয়। তাঁর চিন্তা ও অনুধ্যান জাহ্নবী-যমুনার স্রোতধারার মতই পবিত্র, কল্যাণাত্মিকা, শুধু ভাঙনের মধ্য দিয়ে বেগবান স্রোতের দিগ্‌ভ্রান্তি নয়।

পশ্চিমের রেনেসাঁসের সঙ্গে আমাদের নবজাগরণের একটা সামীপ্য আছে, যদিও স্বরূপে এবং প্রকাশভঙ্গীতে তা অনেকটা ভিন্ন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে ইউরোপে রেনেসাঁসের মধ্যে জীবনচিন্তার একটা সামগ্রিক রূপান্তর ঘটেছে। এর প্রাথমিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মান্দোলন ও চার্চমুক্তি। চার্চের প্রভাব কাটিয়ে মানুষের স্বভাব প্রকাশে তাদের প্রথম শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। জার্মানীর মার্টিন লুথার, ফ্রান্সের ক্যালভিন তাঁদের 'রিফরমেশন' আন্দোলনে ধর্মবিষয়ে 'প্রোটেষ্ট' জানিয়েছিলেন। তাঁদের প্রোটেষ্ট মতবাদ বা প্রোটেষ্টান্টিজ্‌ম ইউরোপে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সমগ্র মহাদেশ কেমন করে একটা দিকে ঝুঁকে পড়ে, ও-দেশের প্রোটেষ্টাণ্ট আন্দোলন তার পরিচয় দেয়। পুরাতন ক্যাথলিক জীবনচর্যার পাশে ধর্মবিষয়ে এই নবচিন্তা

ধীরে ধীরে সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করেছে। সেইজন্যই পরে ওরা রেনেসাঁসের প্রকৃতিকে এমন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। অর্থাৎ ধর্মবিরোধ উৎকটরূপে প্রকাশিত হয়ে জীবনের মৌল চিন্তাবোধকে একেবারে গ্রাস করতে চায়নি। আমাদের দেশে ঠিক এরকমটি হয়নি। আমাদের প্রোটেষ্টান্ট ভাবধারার পিছনের প্রবাহ-গুলির শক্তিও বড় কম ছিল না। সেইজন্য সংস্কারের নামান্তরে প্রতিবাদগুলি জাতিকে আদৌ দীর্ঘস্থায়ী ঝাঁকানি দিতে পারেনি। রিফরমেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অনুকূল-প্রতিকূল চিন্তাবর্ত নবজাগরণের পটভূমি রচনা করতে অনেক দেরী করেছে।

বস্তুতঃ এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে সংকট দেখা দিয়েছে। সেদিনের চিন্তাবিদ মনীষিগণও এর যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। ধর্মান্দোলন ও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে ত্রিধাবিভক্ত চিন্তাধারা ক্রমাগত আমাদের জীবনকে দোলা দিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের তীক্ষ্ণ মননচিন্তা ও জাতীয় চেতনা-বিরোধী সংস্কারপ্রচেষ্টা, খৃষ্টান মিশনারীদের উগ্র ধর্মপ্রচার ও ফলস্বরূপ ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মপ্রীতি এবং রক্ষণশীল সমাজের সংস্কার ও অনুশাসন-প্রীতি আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার কোন স্থায়ী মীমাংসা দিতে পারেনি। এর ফলে একটা শতাব্দী ধরে শুধু আমরা পথ আবিষ্কার করতেই চেষ্টা করেছি। পরস্পরের নিন্দাবিদ্রূপ করে আর সত্যসন্দর্শনের আত্মম্ভরিতা নিয়ে আমরা অযথা কালহরণ করেছি। শতাব্দীর শেষপাদে পৌছাবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ঠিক পথটি নির্ণয় করতে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে জাতির সত্যদীক্ষা ঘটল। শ্রীরামকৃষ্ণ সে সত্যের ভাববিগ্রহ এবং স্বামীজী তার মূর্ত প্রকাশ। তাঁদের কাছেই জাতি সঠিক পথে চলার নির্দেশ পেয়েছে।

আমাদের সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামীজী স্পষ্ট বলেছেন : "প্রায় শত বৎসর ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু উহার দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত আর কি কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, উহার উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; শেষে প্রাচীন সমাজের লোকেরা তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, ঢিলটি খাইয়া পাটকেলটি মারিয়াছেন; আর তাহার ফল হইয়াছে এই যে, প্রত্যেকটি দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির—সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহাই কি সংস্কার? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ?"

এর অর্থ এই নয় যে, স্বামীজী আমাদের সমাজের বাস্তবরূপ এবং তার দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। এদেশের সমাজের ভীষণ-ভয়াবহ রূপ দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন। তিনি দেখেছেন এখানে বিধবার অশ্রুপাতে সময় সময় ধরিত্রী সিক্ত হয়, এখানে জীবন দারিদ্র্যবিষে জর্জরিত, লোকে না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। এই দারিদ্র্যোপহত ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের সংস্কার তিনি বিশেষভাবেই চেয়েছিলেন : "সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি 'আমূল সংস্কার' বা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকুক, আবর্জনা পুড়িয়া যাক এবং একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠিত হউক।" কিন্তু এর জন্য নিজেদের ধর্মকে দোষরোপ করে বা তাকে উচ্ছেদ করে কোন লাভ নেই। "একটি কাষ্ঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলেই যেমন সহজে চিরিয়া ফেলা যায়, তেমনি হিন্দুধর্মের দ্বারাই প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে হইবে, নব্য-সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা নহে।"

স্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনা হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করেই চিৎপ্রকর্ষের সাধনা। এই হিন্দুধর্ম এত বিরাট ও ব্যাপক, তার প্রসারতা ও ঔদার্য এত বিস্তৃত যে, তা যে-কোন সংস্কার বা উজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিরোধী বলে মনে হয় না। জাতির অন্তররহস্যে আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল বলেই তিনি আধ্যাত্মিক সমুন্নতির ক্ষেত্রে ভারতধর্মের অনুশীলন ও সেই

আলোকে পার্থিব কর্তব্য সম্বন্ধে যথানির্দেশ দিতে পেরেছেন।

এখানেই নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস ধীরে ধীরে ধর্মবন্ধনকে শিথিল করতে চেয়েছে। ধর্মের রহস্য উন্মোচনের চেয়ে মানুষের গৌরব ঘোষণাই সেই জাগৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এর জন্য অনিবার্যভাবে ধর্মকে গৌণ করতে হয়েছে। মানবতন্ত্রের বিঘোষিত জয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতি ও বস্তুর সম্যক ভোগ, মনন ও বোধির মুক্তিস্পৃহাই রেনেসাঁসের সাধনা। এর জন্য মানুষের পারমার্থিক তৃষ্ণার বেশ কিছুটা লাঘব করতে হয়েছে। আর তাতে পাশ্চাত্য মানুষ আক্ষেপ করেনি। ফাউস্ট এতখানি বস্তুসম্ভোগকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, এর জন্য শয়তানের হাতে আত্মাকে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এতে আশুলাভের অঙ্ক এত স্ফীত যে, পরিণামের ক্ষতিকে তারা গ্রাহ্য করেনি। এই লাভের চিহ্ন তারা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য সব দিকেই ছড়িয়ে দিয়ে পশ্বাচার আর বীরাচারসাধনাকে বড় করেছে। দাসপ্রথার উচ্ছেদ, শ্রমিক ও স্ত্রীলোকদের রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ, শিল্পকলা ও সাহিত্যের জীবনবাদী অভিব্যক্তির মধ্যে এই মানবমহত্ত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সব বাধাকে—সে বাধা আধ্যাত্মিক বাধা হলেও—তারা সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছে, আর জীবনকে সত্য করতে গিয়ে তার সচেতন-অবচেতন সব উপাদানকেই তারা স্পষ্ট করে তুলেছে। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বিজ্ঞান ও যন্ত্রের মধ্যে জীবনের শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এই অমিত শক্তি আর তার সুপ্রচুর সম্ভাবনা নিয়েই পাশ্চাত্য মানুষের জয়যাত্রা। কিন্তু এর মধ্যে ক্ষতির দিকও বিরাট। বিজ্ঞান আর বস্তু যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন মানুষের আত্মা সংকুচিত হয়, অতিকায় বস্তুস্তূপ মানুষের সকল সত্তাকে বিনষ্ট করে। এ অকিঞ্চিৎ লাভ ও মহতী *বিনষ্টি। এইজন্য পাশ্চাত্যে* মানবতার প্রতিষ্ঠা করতে *গিয়ে তার সমাধি রচনা করা হয়েছে।* রোগীর বিরাট ক্ষুধা যেমন তার স্বাভাবিক ভোগ নয়, তার অসুস্থতারই লক্ষণমাত্র, তেমনি পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতার অমিত আয়োজন কোনরূপ সুস্থ জীবনভঙ্গী নয়, তাদের অসুস্থ জীবনবোধের দুষ্টক্ষুধা মাত্র। রেনেসাঁসের সাধনা আজ এই স্পষ্ট ব্যর্থতার সামনে।

স্বামীজী এই বস্তুভারপীড়িত মুমূর্ষু পাশ্চাত্য জীবনকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এই বলে যে, পশ্চিমী সভ্যতা যদি কোনরূপ আধ্যাত্মিক স্পর্শ না পায়, তাহলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই তা ধ্বসে পড়বে। শক্তির দৌরাত্ম্য দেখিয়ে শাসন করার মত বিড়ম্বনা আর নেই। স্বামীজীর দূরদৃষ্টি যে কত গভীর তা ইউরোপের ইতিহাস প্রমাণ করেছে। তাঁর এই ইঙ্গিত দেবার পর ইউরোপে দু দুটো মহাসমর ঘটে গেল, আর এখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকাও প্রস্তুত। এ সভ্যতা বহুলাংশে আসুরী সভ্যতা, এতে শক্তিমত্ততার চিহ্ন থাকলেও তা জাতিকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না।

এখন একটি মূল বিরোধ ও বৈপরীত্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। রেনেসাঁসের মধ্যে মানবতার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্বীকৃত, তাতে অনিবার্যভাবে আস্তিক্য-বিশ্বাসটি গৌণ হয়ে পড়ে; অথচ অধ্যাত্মরাজ্যের এই শূন্যতাই শেষ পর্যন্ত জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। কোন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সংকটের সমাধান করা সম্ভব নয়। জীবনের মর্মমূলে বৃহৎ কোন সত্যের অস্তিত্ব না থাকলে বস্তুবিশ্বাসটিই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠবে। সোনার ঘর তখন কারাগার বলে ঠেকবে। এই নিশ্ছিদ্র স্বর্ণসৌধে আধ্যাত্মিক আলোকের ফাঁকটুকু রাখতে হবে। স্বামীজী এই আলোকের পথই দেখিয়েছেন। ওদের এই আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে আসতে হবে, বস্তুকে আত্মার আলোকে শোধন করে নিতে হবে।

এইজন্য স্বামীজী যে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা ঈশ্বর-প্রসাদিত। তিনি জানিয়েছেন মানুষের অন্তরশক্তিতে দেবত্ব রয়েছে। তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যে মানুষের প্রতিষ্ঠা ঘটবে, তার মধ্যে ঈশ্বরের চিহ্ন ভাস্বর হয়ে উঠবে। মানুষের অন্তরস্থিত

ভাগবতচৈতন্যকে প্রকাশ করতে পারলেই মানুষ বড় হবে, শুধুমাত্র বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে নয়। বেদান্ত-ধর্মকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ ব্রহ্মে উত্তরণ করতে পারে। যে মানুষ জড়বাদী, দেহবাদী, ভোগবাদী সে পারে না, আত্মবাদী মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব। পশুত্বের আস্ফালনে যোগ্যের উদ্বর্তন এ মতবাদ যথার্থ নয়। ঈশ্বরের প্রকৃতিই হোল মানবিক সীমায় ধরা দেওয়া। সেই ঈশ্বরতাকে নিজের মধ্যে, সবায়ের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে: "Let us be gods and then help others to be gods. Be and Make, let this be our motto."

এই আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রণোদিত, এই ভাগবতচেতনাসমৃদ্ধ মানবতাকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলে, তা পরিত্যাজ্য। ইউরোপ-আমেরিকা যে চার্চমুক্তি চেয়েছে, তার বিকল্পে অস্ত্যর্থক কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। স্বামীজীও একরকম চার্চমুক্তি চেয়েছিলেন—'চার্চে জন্ম ঘটলেও ঘটতে পারে, কিন্তু চার্চের চৌহদ্দীতে মরাটাই যেন না হয়।' আমাদের দেশের চার্চবন্ধন শতাব্দী অনুসৃত লোকাচার, পুরোহিততন্ত্র আর জীর্ণ সংস্কাররাজি। স্বামীজী দেখিয়েছেন "পৌরোহিত্যশক্তি ঊর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ; যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতিযত্নের সহিত বিনির্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শতবেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে; যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদমস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্য শক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত।" অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "সেগুলি অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্মজীবনকে সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মকে এক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়াই ধর্মজীবন হইয়া দাঁড়ায়; এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহা করা উচিত।" স্বামীজী এই রকম আচারতন্ত্র থেকেই ধর্মকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তারপর তিনি এই সংস্কারমুক্ত ধর্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বান উদার, বাধাবন্ধহীন, সকল মানুষের কাছেই অবারিত। অধ্যাত্মবাদের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্ররাজির গূঢ় তত্ত্বসকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। স্বামীজী এরই নির্দেশ দিয়েছেন: "আমাদের উপনিষদে—আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি ঐ-সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন ঐ-সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মতো উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটিতে থাকে।"

সুতরাং স্বামীজীর মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা অভিনব। এতে পরিপূর্ণ মানবস্বীকৃতি আছে, আর তার সঙ্গে আছে শুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার সহজ উপলব্ধি। মানুষ যতই এগিয়ে যাক, এই ঐশী চেতনা তাকে সংযত রাখবে, পশ্চিমের মত তাকে অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ করবে না। নবজাগরণের মূলমন্ত্র মানবমহিমাকে স্বামীজী এইভাবে বরণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু মানবতার ধারণা যতই উদার ও অভিনব হোক, নৈর্ব্যক্তিক থাকলে তা বুদ্ধিবিলাসের সামগ্রী হয়ে পড়বে। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন ধ্যানগম্য, নির্গুণ মানবতা তেমনি কেবল উপলব্ধির বিষয়। বাস্তব মানুষকে বাদ দিয়ে তার ভাবসত্তা বা মহিমা নিয়ে উচ্চকোটির সংস্কৃতিচর্চা করা চলে। এইরকম একটা অসংগতি আমাদের দেশে ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় সংস্কৃতির অভি-যোজন-ব্যবস্থায় যে মানবমহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তার সমান্তরাল প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। স্বামীজী জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন। তাঁর কাছে মানুষ বীর্যবান, অন্তরশক্তিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু দেশের বাস্তবচিত্র তাঁকে বিচলিত করেছে। এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট তমসাচ্ছন্ন মানুষের কাছে তাদের ঈশ্বর-প্রকৃতির কথা স্মরণ করান একপ্রকার মূঢ়তাই। এদেশের

স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। শিক্ষার প্রসাদ দিয়ে, দারিদ্র্যকে দূর করে এদের মহৎ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর জন্য চাই প্রচুর নিষ্ঠা, প্রচুর ত্যাগ। স্বামীজীর বেদান্ত যদি তাঁর আরাধ্য জ্ঞানকাণ্ড হয়, তবে মানবসেবা তাঁর কর্মকাণ্ড। ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের মর্যাদা দেওয়াই মানুষের সাধনা।

রেনেসাঁসের সাধনা করে পশ্চিম যে ব্যর্থ সিদ্ধিলাভ করেছে, তাতে ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানের দিক থেকে তার মূল্য অনেকখানি মনে হতে পারে। কিন্তু এর ভিত্তি অধ্যাত্মবোধবিমুক্ত বলে এত কাঁচা যে তা টিকতে পারে না। ভারতবর্ষও যাতে নবজীবনযাত্রার পথে এই ভুল না করে বসে, তার জন্য সাবধান হওয়া প্রয়োজন। "কোন জাতি যতই প্রবল হউক, এরূপ ভিত্তির উপর কখনই দাঁড়াইতে পারে না। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, সেদিকে প্রথমেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" তারপর এই প্রবুদ্ধ মানবসত্তার বিবিধ কর্মযজ্ঞের শুরু। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, ব্যবহারিক উন্নতি-প্রগতিতে এই মানুষের পরাজয় নেই। ভারতবর্ষে একের পর এক বিরাট দুঃস্বপ্নের রাত কেটে গেছে। পরাধীনতার নাগপাশ একের পর এক তার উপর এসে পড়েছে। বাইরের দিক থেকে যতই আঘাত এসেছে, ততই সে কূর্মবৃত্তিতে আত্মসংকুচিত হয়েছে। এই সংকুচিত প্রাণপ্রকৃতি ভারত মাটির স্বভাবগুণেই বোধ করি একেবারে ভুল পথে যায়নি। কিন্তু ঘটাকাশকে ঘটাকাশ বানিয়ে আত্মতৃপ্তির মোহ নিয়ে সে মুক্তি-মোক্ষের সাধনা করেছে। শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলন এই আন্তর প্রকৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল বলে তার উচ্চারণমন্ত্র কার্যকরী হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-আত্মার সেই বাণীই বহন করে এনেছেন, যা এদেশে যুগযুগান্তের আশ্রিত সত্য। মহৎ গুরুর দুর্লভ কৃপা। ঐশ্বর্যবান ঈশ্বরের বিরাট বিভূতি আর বলিষ্ঠ আত্মজ্ঞানের দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে তিনি জাতিকে সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন—সে সত্য পথের ও লক্ষ্যের উভয়েরই। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ পুরোপুরি পশ্চিমী সংঘাতে আত্মজাগরণ নয়, সে জাগরণ ভারতবাণীর গূঢ়ার্থ উপলব্ধিজনিত আত্মপ্রসারণ আর সেই বিস্তৃত সত্তার চন্দ্রাতপতলে দাবদাহক্লিষ্ট বিমার্গগামী বিশ্বপথিকের আশ্রয়-উপস্থিতি। গুহায়িত অধ্যাত্মতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি, ঈশ্বরচেতনাপ্রসাদিত মানব সমাজের সার্বিক অগ্রগতি, দেশ-জাতি-জীবনের সমূহ বন্ধনমোচন ও মারণ-উচাটন-মন্ত্রসিদ্ধ বিশ্ববাসীর পরিত্রাণ—এই দুশ্চর সাধনতপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগরণের যথার্থ বাণী বহন করেছেন।

বহ্নি-বাণী

নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হয়েছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে opportunity (সুযোগ) দাও।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

স্বামিনো বিবেকানন্দস্য প্রেমধর্মঃ

শ্রীদিলীপকুমারমালিকস্য

ইয়ং ভারতভূমিরুপনিষদাং জন্মভূমির্বসুধাবাসিনো বিশ্বাশ্রয়িনি প্রেমধর্মে অদীক্ষত। ভারতীয়দর্শনস্য নবারুণোষসি বিশ্ববাসিভিরানন্দরসাপ্লুতচেতোভিঃ শ্রুতা ঋষিমুখতো নিঃসৃতা জগদ্ধিতায় বাণী—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥"

যদা ধর্মস্য গ্লানিরধর্মস্য চাভ্যুত্থানং ভবতি অস্যাং ভুবি তদা কোঽপি অবতারঃ স্বজন্মনা ধর্মং সংস্থাপয়তি। তথাহি যদা কর্মকাণ্ডস্য প্রাবল্যাদাসীদস্তংগমিতমহিমা সনাতনো হিন্দুধর্মস্তদা জাতো ভগবান্ বুদ্ধঃ, উদঘোষিতশ্চ তেন ভগবতা ধর্মস্য মহিমা। ঊনবিংশশতাব্দ্যা উত্তরভাগে বস্তুবাদস্য প্রভাবেন ভোগলিপ্তান্ বিশ্ববাসিনো বেদান্তস্যামোঘমন্ত্রবলেন স্বামী বিবেকানন্দো ভোগিনং হৈমন্তিকনিদ্রাতো গারুড়িক ইব সমজীবয়ৎ।

বৈদিকযুগাৎ প্রভৃতি অদ্যাপি ভারতবর্ষে অগণিতসাধকা অজায়ন্ত। বিষমসাধনাসরণিমবলম্ব্য পরমপুরুষায় উদতিষ্ঠন্ত চ তে মহান্তঃ। বারাণসীবদ্রীনাথপ্রয়াগাদিষু তীর্থেষু জটিনঃ কমণ্ডলুপাণয়ো দণ্ডধারিণো ব্রহ্মাস্বাদলিপ্সবঃ সাধবঃ শতশো দৃশ্যন্তে। ইদং খলু ভারতীয়সাধনস্য বৈশিষ্ট্যং যদিদমাত্মকেন্দ্রিকম্। স্বামী বিবেকানন্দস্তু পরিব্রাজকরূপেণ ভারতং ভ্রমিত্বা আত্মকেন্দ্রিকসাধনেচ্ছাং তথাহি আত্মানং জগতঃ ছিত্বা নিরবচ্ছিন্নসমাধিসমুদ্রে নিক্ষিপ্য পরমাত্মস্বাদেচ্ছাং বিহায় বিশ্বকেন্দ্রিকং সাধনং জগ্রাহ। যঃ খলু ধর্মঃ কেবলং আত্মনো মোক্ষায় স্পৃহয়তি ন স ধর্মঃ, তস্য বিকার এব। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় যৎ তদেব ধর্মঃ। তস্য গুরোঃ "অবতারবরিষ্ঠস্য" শ্রীরামকৃষ্ণস্যাপি এতদেবাভিমতমাসীৎ। একদা শিষ্যায় সোঽকথয়ৎ—ত্বং মহান্ ন্যগ্রোধপাদপ ইব বিশ্বস্য তাপিতহৃদয়েষু শান্তিবারি সিক্ষ্যসি—ইত্যেব মে আশয়ঃ। অতস্তেন ভগবতা শিষ্যস্তস্য সমাধিমন্দিরং প্রবেশিতঃ ক্ষৌণীক্ষেমায় নো মধ্যে পুনরানীতশ্চ।

খিলীকৃতগৃহে সামাজিকার্থনৈতিকসমস্যাস্বুদাসীনো ভজনরতঃ সাধকো নাসীদস্মাকং বিবেকানন্দঃ। বেদান্তকেশরী সন্নপি "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" ইত্যুক্ত্বা মানবানাং প্রেমানুরাগং মায়েতি শঙ্কয়া নাবধীরিতবান্ স্বামী বিবেকানন্দঃ। বিশ্বাতীতঃ সন্নপি স ভগবান্ বিশ্বগঃ।

ধর্মশব্দেন ন কিমপি বাহ্যানুষ্ঠানং জ্ঞায়তে। যত্র জীবস্তত্র শিব ইতি বুদ্ধ্যা জীবসেবৈব অনুত্তমো ধর্মঃ। দরিদ্রনারায়ণসেবৈব ধর্মোত্তমঃ। অন্নার্থিনে অন্নদানং পয়োদানং ক্ষুধাতুরায় শিশবে আপদি চ নির্বিণ্ণচেতসি আশ্বাসনদানং বেদান্তবাণ্যা ইহামুত্রকল্যাণবিধানমেব ধর্ম ইতি বিবেকানন্দস্য মতম্। ন খলু ভগবতা বেদান্তশব্দেন ধর্মবিশেষো উদ্দিষ্টঃ অপি তু ভারতীয়ধর্মাণাং সমষ্টিরেব। অতঃ সখায়ং প্রতি কবিতায়াম্ "জ্ঞাতং স্বজীবিতে সারং সত্যং, প্রেম প্রেমৈব পরমার্থ" ইত্যত্র বয়মালোকয়ামস্তস্য জীবনে অনুভূতং সত্যম্। অন্যত্র তেনোক্তম্ প্রেম চিরায় আনন্দস্যৈব বিকাশমাত্রম্।

যৌবনে উপরতে পিতরি বিষমদারিদ্র্যহতো বিশ্বজননীমন্নং যাচিতুং নাশক্নোৎ যঃ স এব পাশ্চাত্যে ব্যথাবিধুরকণ্ঠেন অঘোষয়ৎ—"ভোঃ খ্রীষ্টোপাসকা ভবন্ত উদ্ধারয়িতুং পৌত্তলিকানামাত্মনস্তেষামর্থে ধর্মপ্রচারকান্ হারয়ন্তঃ অনশনাত্তেষাং দেহান্ সংরক্ষিতুং কথং ন যতন্তে? ক্ষুৎক্ষামদেশবাসিনাং কৃতে ভবতোঽহমুপাগতো ভিক্ষাং যাচিতুম্।" ভারতবর্ষস্য ন কোঽপি মহাপুরুষো ভারতীয়ানামীদৃশ আত্মন আত্মীয় আসীৎ। কো নাম

পরাধীনদেশস্য অনন্তদুঃখান্ স্ববক্ষসি উত্তোলয়িতুমশক্নোৎ ? একো বিবেকানন্দ এব সমঘোষয়ৎ—

"হে বীর! পৌরুষমবলম্ব্য সদর্পং ব্রূহি, অহং ভারতবাসী, ভারতবাসী মমানুজঃ। ব্রূহি, দরিদ্রো ভারতবাসী ব্রাহ্মণো ভারতবাসী চণ্ডালো ভারতবাসী মমানুজঃ। ত্বমপি কটিমাত্রবস্ত্রাবৃতঃ সন্ সদর্পং ঘোষয়—ভারতবাসী মে সহোদরঃ, ভারতবাসী মমাসবঃ, ভারতীয়-দেবাঃ খলু মে ঈশ্বরাঃ, ভারতীয়সমাজো মম শৈশবস্য প্রেঙ্খোলনম্, মম যৌবনস্য নর্মাঙ্গনম্, মম বার্ধক্যস্য বারাণসী। উচ্যতাং ভ্রাতঃ, ভারতস্য মৃত্তিকা মম স্বর্গং, ভারতস্য কল্যাণং মমাপি কল্যাণম্। পুনরপি উচ্যতা-মহোরাত্রম্—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্ব, দেহি মে বীর্যং, দূরীকুরু মাতঃ দৌর্বল্যং কাপুরুষত্বঞ্চ, কুরু মাং মানুষম্।"

যথা হি খ্রীষ্টধর্মে তথৈব হিন্দুধর্মে প্রেমৈব ধর্মভাবস্য শ্রেষ্ঠবিকাশত্বেন স্বীকৃতম্। উপনিষদ্পুরুষস্য স্বামিনো বিবেকানন্দস্য প্রেমধর্মস্য ভিত্তিভূমিরাসীদুপনিষৎ। ন স ভগবান্ জীবং ব্রহ্মণঃ পৃথকৃত্বেনালোকয়ৎ। জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ—ইদং পরমসত্যং তেনানুভূতম্। ন কেবলং ভারত-বাসিনোঽপি তু বিশ্ববাসিন আসন্ তস্য প্রেমপাত্রম্। তেষাং ন কেবলং দেহানামাত্মনামপি উন্নতয়ে স্বপ্রাণব্যয়মকরোৎ স্বামী বিবেকানন্দঃ। তস্য দেশকালপাত্রাতীতপ্রেম অবিচার্য্য জাতিং ধর্মং সম্প্রদায়ং বা প্রাবহৎ।

আচার্যমতানুসারেণ মনুষ্যত্বে পাপারোপণমেব হি নিকৃষ্ট-তমং পাপম্। অমৃতস্য পুত্রাণাং কুতঃ সম্ভবেৎ পাপম্। সহস্রদ্বীপোদ্যানে বারবনিতানালোক্য সভয়ং ন দূরমপয়াত আচার্যোঽপি তু তাসাং দুঃখানি বিলোক্য আচার্যস্য পদ্ম-পলাশনেত্রাণি অশ্রুপরিপূর্ণানি জাতানি। যঃ সর্বভূতেষু তমেকমাদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তং পশ্যতি কুতস্তস্য ঘৃণা ?—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকমেকত্বমনুপশ্যতঃ ॥

(ঈশোপনিষদি)

বহ্নি-বাণী

কপট, হিংসুক, দাস-ভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যাহারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তাহারা কখন কিছু করিতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাস-সুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক-স্বরূপ। এমনকি, সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু করিতে পারেন না।

সংঘবদ্ধ অন্ধকার ও বিবেকানন্দ

শ্রীরাখাল বর্মণ

তুমিই না বলেছিলে, জীবে প্রেম করে যেই জন,—
বলেছিলে তুমিই না, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ?
অথচ আশ্চর্য কী যে বিংশ শতাব্দীটা এই প্রৌঢ়ত্বে এসেও
প্রেম নয়—ঈশ্বরকে খয়রাতি দানে কিছু করুণা ছড়ায়।
এবং সে শতাব্দীর মুখে আঁটা সভ্যতার সমৃদ্ধ মুখোশ।
সে মুখোশ কেউ যদি নিশিত অস্ত্রের ঘায়ে কাটে—
এ সভ্যতা ক্ষিপ্ত হয় কুকুরের মতো পচা মাংসের চক্রান্তে।
দলবদ্ধ ভদ্রতারা সম্ভ্রান্ত রক্তের অংশীদার
অথচ তোমার সেই বহুরূপের ঈশ্বরকে ব্যঙ্গ করে কতো।
কবন্ধের অন্ধকার শতজন্ম-জয়ন্তীর রাতে—
অরুন্তুদ বেদনায় আধিক্লিষ্ট এ পৃথিবী কাঁপে,
সংঘাতে সংক্ষুব্ধ আজ প্রতিরুদ্ধ আশা ও বিশ্বাস।

সূর্যের আলোর প্রতীক্ষায় দিনের আলোর মহাতরঙ্গের প্রত্যাশায়
আমরা এখনো রাত জাগি। রাত জাগি। শীত-শীত রাত।
হিমেল হাওয়ায় কাঁপে রাত। গনি গাই গান।
গান গাই যে গানে অনেক বিবেকানন্দের জন্ম হবে।
চেষ্টায় তেজ, উদ্যোগে সাহস, মনে বল, ইস্পাত ধমনী—
এইসব তুমি চেয়েছিলে। শ্রদ্ধাবান বীর্যবান হ'তে
তুমি বলেছিলে। অথচ ওরা তো বীর্যহীন শ্রদ্ধাহীন।

সকল অচেতচিত্তে তুমি আনো চেতনার বিদ্যুৎ বিস্ময়,
অমিতবীর্যের তেজ আরবার ছড়াও ছড়াও,
পোড়াও পোড়াও পূতিগন্ধময় সমাজের শব।
আদিত্যসংকাশ তুমি আলো ও উত্তাপ দাও আমাকে এবং
রামশ্যাম অবিনাশ দুখী পাত্র সুখী সামন্তকে—
সংঘবদ্ধ অন্ধকার কেটে কেটে ছড়াবোই সূর্যের উল্লাস,
অত্যয় উত্তীর্ণ হবো প্রসারিত আলোর উৎসবে।

সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের উচ্চ ও মহৎ বিশেষত্বগুলির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আধুনিক ভারতের রাষ্ট্র সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কার সাধন করিতে উপায় নির্দেশ করেন। তাঁহার নির্দেশিত উপায়-সমূহ সঠিকভাবে পালন না করার জন্য আজ আমরা অধিকাংশ কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতারা আমাদের জাতীয় জীবনে নানা সংস্কার ও গঠনমূলক কাজে যে সমস্ত পথ দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার অধিকাংশ লক্ষ্যের সীমায় পৌঁছাইতেছে না। কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা স্বামীজীর নির্দেশিত পথে চলিতে চাহিতেছি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীন ভারতের জটিল সমস্যাসমূহ দূরীকরণে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনই একমাত্র প্রকৃত পন্থা।

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যা ও উহাদের সমাধান-পন্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালের পুরাতন হইলেও আজ পর্যন্ত উহা নূতন এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁহার যোগদৃষ্টিতে অতীত ও বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলি এবং উহার সমাধানসমূহ অভ্রান্তরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্যাসমূহের অনেক মূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। এইজন্য ইহা পুরাতন হয় নাই।"

আচার্য বিবেকানন্দ ভারতের সর্ববিধ উন্নতিসাধনের জন্য ধর্মের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতে ধর্মের অভ্যুদয় ঘটিলে অন্যান্য রুদ্ধ স্রোতগুলিও উহার সহিত ঠিকপথে চলিবে। তিনি হিন্দুসমাজের দোষগুলি বারবার দেখাইয়াছেন এবং ঐগুলি ত্যাগ করিয়া অতীত ও বর্তমানের গুণসমূহ লইয়া আদর্শ হিন্দুসমাজ গঠনে প্রয়াসী হইতে যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন।

যুগের প্রয়োজনে এবং জীবনরক্ষার তাড়নায় পৃথিবীর সকল জাতি প্রাচীন রীতিনীতি ত্যাগ করিয়া নূতন রীতিনীতি গ্রহণ করে। একই নিয়মে হিন্দুসমাজও দিনদিন নবরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ভারতের বর্ণাশ্রম বহুদিন পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছে। স্বামীজীর মতে এই প্রথার পুনঃ প্রবর্তনপ্রচেষ্টা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত অতীতে কোন একটা বিশেষ নিয়ম ও উপায় হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিলেও, বর্তমানে উহার কল্যাণকর ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে পারে। তাহাতে বিস্ময়ের বা ক্ষোভের কারণ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে সমাজ সংস্কার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তবে যুগের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে। ভোগের অধিকার-পার্থক্য ও উচ্চনীচভাবসম্ভূত অস্পৃশ্যতা এবং অনৈক্য দূর করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। বর্তমানেও হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেক জাতি নানা সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ দোষের নয়, কিন্তু ভোগ-অধিকার-পার্থক্য মহা বিপদের কারণ হইয়াছে। যদি কাহারও আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তাহার আর আশাভরসা নাই।"

অথচ এমন এক সময় ছিল যখন হিন্দুর গৌরবময় যুগে হিন্দুসমাজে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। রামায়ণ মহাভারতে দেখিতে পাই বিদুর, কর্ণ, ব্যাসদেব প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তর হইতে উচ্চে আরোহণ করিয়া সকলের

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মতে হিন্দুসমাজে যাহারা তথাকথিত নিম্নজাতি তাহাদের উন্নয়নে সচেষ্ট না হইলে আমাদের কোন আশা নাই।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন হিন্দুসমাজকর্তাদিগের হঠকারিতার জন্য হিন্দুসমাজের বহু অনুন্নত নরনারী মূর্খতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে পশুজীবন যাপন করিতেছে। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। হিন্দুসমাজের এই জীবনমরণ সমস্যা সমাধানে স্বামীজী জাতিকে একসূত্রে গাঁথিতে প্রয়াসী হন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধী আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন। আমাদের গণপরিষদ্ "অস্পৃশ্যতা" পালন দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বহুপূর্বেই এই ব্যাধির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের প্রেরণা ও উহা দূরীকরণের উপায়সমূহ স্বামীজীর নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। উভয়েই বিশ্বাস করিতেন ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানে এই দুই নেতার দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বর্তমান অবনতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল। তিনি ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহা দূরীকরণে প্রয়াসী হন। তাঁহার মতে পৃথিবীর আর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় মহান ভাব প্রচার করে নাই। আবার কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন ও দরিদ্র-শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা দেখায় নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "যতই চেষ্টা করুক আর উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীকে পদদলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দের ভালমন্দ বিচারের অধিকার আমাদের নাই। আর একজন বিবেকানন্দই তাঁহার কার্যাবলীর সমালোচনা করিতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদি জগতে কোন পাপ থাকে, তবে তাহা দুর্বলতা।" সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া নবভারত গঠনে তাঁহার উদার আহ্বান বিশ্ববাসীকে সচকিত করিয়াছিল। তাঁহার মতে দুর্বলতা পাপ এবং ইহাই মৃত্যু।

স্বাধীন ভারত বর্তমানে বিভিন্ন মত ও পথের দ্বন্দ্বে, বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বামীজী শাশ্বত ভারতকে যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যদি আমরা গ্রহণ করি তবে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নিশ্চয়ই বর্তমান ভরাডুবির হাত হইতে দেশকে, জাতিকে তথা বিশ্ববাসীকে রক্ষা করিতে পারিব। স্বামীজীকে সার্থকভাবে স্মরণ করিতে হইলে এবং ভারতকে পুনরায় বিশ্বসভার যোগ্য আসনে স্থান পাইতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার বাণী ও ভাবাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

নব ভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যখনই ভারতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুদের রক্ষার্থে এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশসাধনে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভারতে যখন শত শতাব্দীর পরাধীনতা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে করে রেখেছে আচ্ছন্ন, যখন উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা তখন সেই অন্ধকার যুগে কুসংস্কারের ঘনমেঘের আড়ালে ভারতবাসী একদিন হঠাৎ দেখল আশাবিদ্যুতের চকিতদীপ্তি। শুনল মেঘমন্দ্রস্বরে কে যেন শাশ্বত ভারতের বাণীকে পুনরায় উদ্ধৃত করছেন,

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
... ...
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

ভারতবাসী বহুদিন পরে শুনল জাগরণের বাণী। কে যেন তাদের অন্তরে সুপ্ত অন্তরাত্মাকে নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলল : "Have faith that you are all, my brave lads, born to do great things...no, not even the thunderbolts of heaven frightened you, but stand up and work...Your country requires heroes ; be heroes. Stand firm like a rock...Be brave, be brave ; man dies but once. *My disciples must not be cowards. I hate cowardice.*" অত্যাচার-ক্লিষ্ট ভারতবাসী দেখল নবপ্রভাতের অরুণিমার মাঝে এক দৃপ্ত সন্ন্যাসী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন নবতর ভবিষ্যতের সন্ধানে—মুখে তাঁর অভয়বাণী, "হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। ভয়শূন্য হও,—অভীঃ।"

এই নব সন্ন্যাসীই নবভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর নিজের ভাষাতেই আছে, "Be and make." তাই নবভারতের স্রষ্টা হবার পূর্বে তাঁকে নিজেকেও নতুন করে ঢেলে সাজতে হয়েছিল। আর বাল্যের বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল ভবিষ্যতের স্রষ্টা বিবেকানন্দ। তাঁর ছাত্রাবস্থার অনুসন্ধিৎসা, আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভীকতাই প্রমাণ করেছিল ভবিষ্যতে মানুষগড়ার কাজে লাগবে এই বালক। প্রত্যেককেই আচার্যের কাছে শিক্ষা নিতে হয়। দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ—বিশ্বপাবন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—হলেন বিবেকানন্দের আচার্য। চলল দিনের পর দিন তৈরী হওয়ার, প্রস্তুত হওয়ার কঠোর সাধনা। শেষে এল সিদ্ধি অন্তরে নূতন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকপ্রভা নিয়ে। তাই জগতের শত ঝঞ্ঝাটের মাঝ থেকে সরে যেতে চাইলেন বিবেকানন্দ—প্রার্থনা করলেন ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধির। কিন্তু আচার্য বুঝেছেন এ শিষ্য কাজ করবে। তাই তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মের পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন—"ভেবেছিলাম তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, শত শত তাপিত প্রাণ তোর ছায়ায় এসে শান্তি পাবে।"

শিষ্যের শিক্ষা সমাপ্ত করে তার হাতে ভবিষ্যতের ভার অর্পণ করে আচার্য মরলীলা সংবরণ করলেন। বিবেকানন্দের উপর এসে পড়ল দায়িত্বের বোঝা। এতদিনের শিক্ষা এবং সাধনার এবার বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে। কিন্তু ভারতের দিকে, ভারতবাসীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়া

LIBRARY
No............

মাত্র বিশাল চিত্তাকাশ আলোড়িত হল, তিনি ব্যথিত হলেন এদের দুঃখে। বহুদিনের পরাধীনতায় এরা হারিয়েছে আত্মশক্তি, কুসংস্কারের বেড়াজালে সনাতন উদার ধর্মের পথ হয়েছে রুদ্ধ, কাপুরুষতা এদের সত্তাকে তামসিক অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে—এরা এদের প্রাণকে হারিয়ে হয়েছে জড়ের পিণ্ড। কিন্তু নতুন উদ্যমে বুক বাঁধলেন বিবেকানন্দ—এদের দেখে নিজে হতাশ হলে চলবে না—নতুন আশার বাণী শোনাতে হবে। তাই ভারতবাসী শুনল অশ্রান্ত কর্মী বিবেকানন্দের নতুন আশ্বাসবাণী —"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ—মা জাগছেন তাঁর দীর্ঘ গভীর ঘুম থেকে। আর কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আর তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন না।"

সৃষ্টির অর্থ শুধুমাত্র নতুনের আনয়ন এবং তার সংস্থাপনাই নয়, পুরাতনকে বর্তমানের সংযোজনায় নবতম পথসৃষ্টি। তাই বিবেকানন্দ নতুন ভারত সৃষ্টি করেছিলেন বলতে শুধুমাত্র নতুন ভাবধারা আনয়ন করেছিলেন তা নয়। আবার কেবলমাত্র প্রাচীন ভাবধারাকেই সংহত করেছেন তা নয়। অতীত ভারতের অধ্যাত্মবাদকে বর্তমান পাশ্চাত্ত্যের জড়বিজ্ঞানের কর্মনিষ্ঠায় মিলিত করে নতুন খাতে ভবিষ্যতের রূপায়ণ তিনি করেছেন। তাই তিনি নবভারতের স্রষ্টা।

ভারতবাসী হারিয়েছে তার আত্মশক্তি। সে আজ কাপুরুষ, ভীরু। এ দৃশ্যই দৃপ্ত পুরুষকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের চোখে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাই তিনি প্রথমেই এই ভীরুতা, কাপুরুষতাকে দূর করে মানুষের মনকে নতুন জাগরণের ডাকে সাড়া দেওয়াতে চেষ্টা করেছিলেন। এই কাপুরুষতা দূর হলেই ভারতবাসী পশুত্ব পরিহার করে মনুষ্যত্ব অর্জন করবে। তাই বজ্র-নির্ঘোষে ভারতবাসী শুনল নতুন আহ্বান, "সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই। তুমি সব কিছু করতে পার। এইটে বিশ্বাস কর। কখনও ভেবো না তুমি দুর্বল। কেউ তোমাকে পথ না দেখালেও তুমি সকল কিছু করতে পার। তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি। ওঠ, দাঁড়াও, তোমার মধ্যে সেই অনন্ত শক্তিকে, সেই দেবত্বকে প্রকাশ কর।"

ভারতের প্রথমতম বাধা, ভারতবাসী অশিক্ষিত। তাই ধর্মের নতুন আলোক তারা পেতে পারে না। জ্ঞানরাজ্যের দ্বারে তাদের প্রবেশ নেই তাই তাদের মধ্যে চাই শিক্ষা। বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা তত্ত্বগ্রহণ বা তথ্য পরিবেশনের উপায় মাত্র নয়, শিক্ষা জীবননিয়ন্ত্রী শক্তির উদ্বোধন। তাই স্বামীজী চেয়েছেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান, তারই প্রকাশ করা।—"Education is the manifestation of the perfection already in man." মানুষের অভ্যন্তরস্থ আত্মশক্তিকে সুশিক্ষণ দ্বারা জাগরিত করা যায়। তাই শিক্ষার অর্থ স্বামীজীর কাছে "আবিষ্কার, স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়"। ছাত্র কখনও শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। শিক্ষক ছাত্রকে তার অন্তর হতে শিক্ষালাভে সহায়তা করেন মাত্র। তাই শিক্ষক ও ছাত্র অভিন্নাত্মা হওয়া প্রয়োজন। একাগ্রতাসাধনই শিক্ষার মূলকথা। একাগ্রতা দ্বারাই অন্তরের জ্ঞানখনির সন্ধানলাভ সম্ভব।

স্বামীজী শিক্ষাকে নেতিমূলক হতে দিতে চাননি। বর্তমান শিক্ষার প্রধান দোষ তা মানুষকে আত্মপ্রত্যয়হীন করে। তাই স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, "যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে সাহায্য করে না, যাহা আমাদের সৎসাহস বৃদ্ধি করে না, যাহা পরোপকারের ইচ্ছা জাগ্রত করে না এবং মানুষকে সিংহতুল্য সাহসী করে না, তাহা কি শিক্ষানামের যোগ্য?" এই নেতিমূলক শিক্ষাই মানুষের ভিতরের মনুষ্যত্বকে দাবিয়ে রেখেছে। এ শিক্ষায় শুধু অক্ষরজ্ঞানই সার। স্বামীজীর ভাষায়, "আমরা এমন শিক্ষা চাই যাহা আমাদের চরিত্র গঠিত করে, মনের জোর বৃদ্ধি করে, বুদ্ধি বিকশিত করে এবং মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করে।" তাই এই ইতিমূলক শিক্ষা মানুষ গঠন করে—স্বামীজীর এই শিক্ষার অপর নাম "Man-making education."

শাস্ত্রে আছে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" তাই শ্রদ্ধাবর্জিত শিক্ষা মানুষকে লাভের পথ থেকে বঞ্চিত করে ক্ষতির পথেই টেনে নিয়ে যায়। আর এই শ্রদ্ধাবোধকে

জাগরিত করার জন্যই স্বামীজী দেশের সর্বত্র পুরাণ, উপনিষদের প্রসার লাভ করাতে চেয়েছিলেন। শ্রদ্ধা চাই, বিশ্বাস চাই, আত্মপ্রত্যয় চাই, ধর্মবোধ চাই, নইলে আমাদের সকল শিক্ষায়োজন ব্যর্থ।

জনশিক্ষার পথে প্রধান বাধা দারিদ্র্য। জীবনপথে চলতে গিয়ে দারিদ্র্যের বোঝার ভারে যাদের পিঠ গিয়েছে বেঁকে, তারা আবার শিক্ষার পথে এগুবে কি করে? তাদের না আছে উৎসাহ, না আছে আশা! তাই স্বামীজী শিক্ষিতদের ডাক দিয়ে বললেন, "দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষার জন্য না আসে, তবে শিক্ষককে তাহাদের নিকট যাইতে হইবে।" দলে দলে শিক্ষিতদের তিনি পাঠালেন ভারতের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে—ভারতবাসীকে শোনাতে নতুন আশার বাণী, নতুন শিক্ষার পথ। তবুও ভারতের দারিদ্র্যভারে নিষ্পেষিত জনগণের অসহায় দুঃখ দেখে স্বামীজীর চিত্ত গোপনে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করেছিল। তাই তারই সজল প্রার্থনা এসে পৌঁছল সকল ভারতবাসীর দ্বারে, "দরিদ্র জনসাধারণ তোমাদের দেবতা হউক। তাহাদের জন্য চিন্তা করো, তাহাদের জন্য কাজ করো। অনবরত তাহাদের জন্য প্রার্থনা করো।" এই ভাবেরই অন্যত্র বহিঃস্ফুরণ দেখি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খোদেবো ভব"—এর মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার পথে স্বামীজী প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করলেও পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানকে একেবারে অস্বীকার করেননি। এদের দুই-এর মিলিত ভাবধারায় ভারতের শিক্ষাকে সংস্কার করেছেন নতুন আলোকে। তাই নবভারতের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতকে শিক্ষিত করে তোলার শ্রেষ্ঠ ব্রতী স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাচ্যের জনগণ তমোগুণে আচ্ছন্ন। আধ্যাত্মিক সত্যকে লাভ করতে গেলে প্রয়োজন সত্ত্বগুণের। তাই পাশ্চাত্যের কর্মনিষ্ঠা এবং কর্মের প্রতি ভক্তিস্বরূপ রজঃগুণকে তিনি আনয়ন করলেন প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে। আর তখনই প্রাচ্যের জনসাধারণ পেল কর্মের প্রতি আকর্ষণ—তখনই তাদের উন্নতির অভিযান হল শুরু।

বর্তমান নারীপ্রগতিতেও বিবেকানন্দের অবদান বড় কম নয়। তাঁর মতে ভারতের নারীকে মর্যাদাদানই ছিল নারীপ্রগতির প্রথম ধাপ। পর্দার আড়াল থেকে ভারতের নারীকে তিনি ডাক দিলেন মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝে কর্মের পথে। প্রাচ্যের নারীকে পাশ্চাত্যের কর্মস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে এক সামঞ্জস্য গঠন করলেন স্বামীজী। মানবের জীবনপথে অভিযানের মধ্যে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। তাই আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লৌহনিগড়ে যখন বৈদান্তিক নারী ও পুরুষের সমানাধিকার বিলুপ্তপ্রায় তখনই সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের রুদ্ধদ্বারে আঘাত হানল শাশ্বত ভারতের বাণী, "Women must be put in a position to solve their problems in their own way."

জাতির সম্মুখে নারীজাতির মহান আদর্শকে তুলে ধরে তিনি ভারতনারীকে ডাক দিলেন, "ভুলিও না নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।" স্বামীজী নারীজাতির উন্নতিই ভারতের উন্নতি—একথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, "নারীজাতির উন্নতি ও জনগণের জাগরণ—এ দুয়েরই প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং তখনই কেবল দেশের, ভারতের কল্যাণ সাধিত হবে।" নারীজাতির উন্নতি সাধন করে স্রষ্টা বিবেকানন্দ ভারতের একটা বিশাল অঙ্গকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।

পরিব্রাজকবেশে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, যাকে নতুন করে গড়তে হবে তাকে পুরোপুরি না জানলে সৃষ্টির কাজে খুঁত থেকে যাবে। তাই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দেশের নদ-নদী গিরি-কান্তার সর্বত্র ঘুরে ভারতের মূলসত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতের প্রাণ তাঁর দেশবাসীদের। আর তখনই তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল হিন্দুসমাজের প্রধান সমস্যাগুলি। তিনি দেখেছেন অস্পৃশ্যতা তার শিকড় প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল করে গেঁথেছে, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য জনসাধারণকে করেছে নিপীড়িত, শিক্ষার অভাবে তাঁর সাধের দেশবাসী হয়ে রয়েছে অন্ধ। তাই তাঁর কাজ হল শিক্ষা বিতরণ করে

তাদের মন থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে আর মোচন করতে হবে তাদের দারিদ্র্য।

তাই স্বামীজী ভারতবাসীর পরানুবাদ, পরানুকরণ এবং পাশ্চাত্ত্যমুখাপেক্ষিতাকে ঘৃণা করেছেন। ডাক দিয়েছেন জনে জনে—তাদের আত্মোদ্বোধনের সহজ উপায় বলে দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যের মোহ দুরীভূত করে তাদের কর্মবাদকে প্রাচ্যের জনগণের আদর্শ করেছেন। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতাকে নিজের নবতম চিন্তাধারার সাথে মিলিয়ে তার আকর্ষণে রাজনৈতিক কুটিল গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে এনেছেন ভারতের মানুষকে। তারপর ডাক দিয়েছেন দরিদ্র জনসাধারণের উদ্দেশে, "ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

স্বামীজী নিজের দেশকে ভালবেসেছেন মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ভক্তি করেছেন অন্তর দিয়ে। তাই তাঁর স্বদেশচিন্তা তাঁর মনে চিরতরে জাগরিত থেকে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে তাঁর স্বদেশ ভারতের উন্নতিসাধনে। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী—মানবজাতির কল্যাণ-কামনাই তাঁর সাধনা। কিন্তু স্বদেশের বন্ধনে, মাতৃভূমির বাহুডোরে বাঁধা পড়েছেন তিনি—তাই তাঁর সন্ন্যাসধর্মের আদর্শের পথ থেকে কি তিনি বিচ্যুত হয়েছেন? না, তা নয়—মানবজাতির কল্যাণ-কামনা—সমগ্র বিশ্বজগতের মুক্তিসাধনাই ছিল তাঁর কর্মের আদর্শ উদ্দেশ্য। কারণ, অধ্যাত্মভাবের লীলাভূমি এই ভারত। তাই এখানকার জনগণের মনে যদি সেই ভাবধারার পুনরুজ্জীবন করা যায় তবে বিশ্বজগতের মানবের সামনে এই অধ্যাত্মবাদের আদর্শ স্থাপিত হবে। আর তখনই মুক্তিসাধনায় ব্রতী হবে মানবকুল। তাই তাঁর এই স্বদেশপ্রেম পরোক্ষভাবে মানবজাতিরই মুক্তিপিয়াসী।

স্বামীজী কন্যাকুমারিকায় বসে তাঁর ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন এই হিমালয়শীর্ষ জলধিঘেরা ভারতভূমির দিকে। তাঁর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে শতযুগের উৎপীড়িত মানুষের পশুরূপ—জগতের শ্রেষ্ঠশক্তিপূর্ণ জাতি আজ শক্তিহীন জড়ের শিশু।

এই ভীত, মানুষজড়ের দলে আজ তাঁকে এনে দিতে হবে নতুনের অভয়বাণী। এই দরিদ্রের মুখে তুলে দিতে হবে অন্ন। তাই ভগবানের প্রেরণায় তাঁকেই আয়োজন করতে হবে দরিদ্রনারায়ণের সেবা-যজ্ঞ, তাঁকেই যেতে হবে এই বিস্তীর্ণ জলধি অতিক্রম করে বিদেশে। সেখানে শোনাতে হবে, "আমি এদেশে এসেছি দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।" বিদেশ হতে আনতে হবে অর্থ আর প্রেরণা—আর এদেরই সাহায্যে প্রাচ্যভূমি ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে নতুন ভাবে।

ভারতে অতি প্রাচীনকাল হতে ধ্বনিত হয়ে আসছে "সোঽহং" এবং "তত্ত্বমসি"র বাণী। ভারত জানে প্রতি আত্মায় ব্রহ্ম বিরাজমান। আর উপনিষদের এই গূঢ়ার্থ বাণীকেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল ভাষায় রূপ দিয়েছেন, "যত্র জীব, তত্র শিব।" আর তারই বাণীমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের মধ্যে স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" নরকে নারায়ণরূপে কল্পনায় সেবাধর্মের উদ্ভব। এই-ই ভারতের মনুষ্যত্ব ধর্ম। আবার উপনিষদ বলেন, "আনন্দই ব্রহ্ম।" তাই জীবজগৎ সমস্ত কিছুর মধ্যেই আনন্দের সন্ধানী। কিন্তু জড়ের মধ্যে আনন্দের লেশমাত্র নেই—কারণ, ব্রহ্মস্বরূপ হচ্ছেন আত্মা। তাই আত্মোপলব্ধি চাই। আর এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলেই ত্যাগ করতে হবে জড়বস্তুকে। তাই বিবেকানন্দের বাণী ধ্বনিত হয়েছে ভারতের যুবকদের প্রতি, "ত্যাগী হও।" এই ত্যাগ এবং সেবাধর্মের মাধ্যমেই বিবেকানন্দ ভারতকে করে তুলেছেন উন্নততর। তাই নবভারত-সৃষ্টির পথে ত্যাগ এবং সেবাধর্ম বিবেকানন্দের বিশেষ অবদান।

ভারতের জনগণের দুর্দশার জন্য বিবেকানন্দ বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করেননি। দায়ী করেছেন তৎ-কালীন অভিজাত সম্প্রদায়কে। তাই এদের অত্যাচারে আর এদের প্রবর্তিত শত সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে ভারতের অন্তঃপ্রবাহিণীর মূলসুর। তাই বিবেকানন্দ

অভিজাত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য ভারতবাসীকে জানিয়েছেন নবতর আহ্বান, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, বেরুক জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির ভেতর থেকে, বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।...সহস্র সহস্র বৎসর এরা অত্যাচার সয়েছে...আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।"

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন—"পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে কিন্তু আমাদের Politics নাই।" এই Politics বলতে তিনি শক্তি ও চাতুরীর জুয়াখেলা বোঝাননি। বুঝিয়েছেন একটা সুস্থ সবল রাষ্ট্রের আত্মশক্তির সত্যবাণীকে। বিবেকানন্দ এই সত্যবাণীরই অনুপন্থী ছিলেন। হয়ত তিনি গান্ধীজীর মত সক্রিয় রাজনীতি-পরিমণ্ডলে বিচরণ করেননি, তবুও রাষ্ট্রের মর্যাদায় তথা বিশ্বরাজার মহিমান্বিত আদর্শের অনুকল্পে মনুষ্যত্বের সুদৃঢ় ভিত্তিতে চেয়েছিলেন একটা সার্বভৌম এবং একক রাষ্ট্র গঠন। তাই গান্ধীজী হয়তো স্বদেশ-বৎসলতার পরাকাষ্ঠায় বৈদেশিক সব কিছু বর্জনের আদর্শকে মেনে নিতে পেরেছেন এবং রাষ্ট্রের গুরুর আসনে বসে জনসাধারণকে তা মানতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তবুও বিবেকের কশাঘাতে মনুষ্যত্বের শ্রেয়বোধকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই রাষ্ট্রনায়ক রবীন্দ্রনাথ এই সসীম সাধনায় অসীম মানবাত্মার অবমাননাকে স্বীকৃতি দেননি। দেশের দুর্দিনে যাঁর বাণী সমগ্র বিশ্বকে সচকিত করত তিনি রাজনীতির ঘোলাটে স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে নারাজ। তাই মুক্ত বিহঙ্গ বিশ্বের আকাশে নীড় খুঁজেছে ক্লান্ত রাজনীতির ক্লিষ্ট সত্তাকে সুপ্ত করে নতুন সত্যের জাগরণে। বিবেকানন্দও নিজেকে রাজনীতির মধ্যে জড়িত করেননি। তবুও তাঁর বাণী রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের মনে যে বীজ বপন করেছিল তা উপ্ত হয়েছে বহু বৎসরের মানবচেতনায়। স্বামীজী অনাগত ভবিষ্যৎকালে অদূরের শত্রুদের পদধ্বনি শুনেছিলেন; সে কাল এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে চীনের ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে। তবুও এর মধ্যেও "অপাবৃণু," "অভীঃ" এবং "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" চিরন্তন শক্তির ত্রয়ী বাণী আমাদের চিরকাল সাহায্য করবে অমোঘ মৃত্যুর মুখ থেকে অমর মানবাত্মার উদ্ধার সাধনে এবং এই ত্রয়ী বাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" এবং রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থের" স্বপ্নকে সফল করে তুলবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদেশিনী "নিবেদিতা" এদেশের দেশপ্রেমে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই স্বামীজীর ভাবধারা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য দেশের প্রতিটি বিপ্লবীকে এককালে উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশপ্রেমে—যদিও স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবে বা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেই পরকালের বিপ্লবীরা খুঁজে পেয়েছিল দেশপ্রেমের উৎস, তাই ভারতকে স্বাধীন করার মাঝেও তাঁর অবদান কম নয়।

তাঁর বাণী, ভাব, ভাষা কখনও সসীম, খণ্ড, দেশ বা কালে সীমিত থাকেনি। তাই তিনি নবভারতের স্রষ্টা হয়েও নববিশ্বের স্রষ্টা। দেশের উন্নতির জন্য চিন্তা করেছেন বিভিন্ন মনীষী। তাঁরা বিভিন্ন দিক হতে দেশের উন্নতি সাধন করেছেন। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ প্রভৃতি সমস্ত দৃষ্টিকোণ হতে এত সুন্দরভাবে দেশকে সমালোচনা করে তাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়নি আর কেউ। তাই স্বামীজীকে "ভারতপথিকৃৎ" বললেও ভুল হয় না।

আজ আমরা স্বামীজীর যুগকে পেরিয়ে এসেছি। স্বামীজী আমাদের বিভিন্ন দিক হতে উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে হয় তবুও আধুনিক ভারতের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। এখনও কিছু সমস্যা ভারতবাসীকে করছে পীড়িত। এসময় যদি স্বামীজীর বাণীকে এবং তাঁর কর্মপন্থাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি, তবেই জাগবে তাঁর কল্পনার সৃষ্টি নবভারত।

তাই আজ আমরা যেন তাঁর আদর্শকে স্মরণ করি।

যিনি আমাদের এই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি এখনও আছেন আমাদের মধ্যেই। আর তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করছেন তিনিই, "Behold, Vivekananda still lives in the soul of his mother and in the soul of her children." তাই আজ আমাদের কর্তব্য তাঁরই বাণীকে স্মরণ করে জাগরণের পথে, নবসৃষ্টির পথে দেশকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। তাঁর শাশ্বত বাণী আজও আমাদের এগিয়ে চলার পথে আশা দেবে, "You are Divine, march on and on, nor right nor left but to the goal." আর তাঁর বাণী আমাদের জাগরণে সহায়তা করবে, "Arise, awake, stop not till the goal is reached."

লেখক সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে বর্তমান প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

বহ্নি-বাণী

শরীরে বল নাই,—হৃদয়ে উৎসাহ নাই,—মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই। কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্র-বলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" —এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনা গে। সকলকে ধরে ধরে বল্ গে যা, তোমরা অমিতবীর্য—অমৃতের অধিকারী।

বিবেকানন্দ সম্পর্কিত কয়েকটি অনুবন্ধ

সামসুল হক

পাখীর প্রার্থনা :

আমাকে নিটোল ব'লে ব্যঙ্গ করে শিল্পী কবি, হে প্রিয় ঈশ্বর,
এই কণ্ঠ নাক মুখ বিবেকানন্দের মতো হ'য়ে যেতো যদি
আভূমি প্রণত হ'য়ে বলতাম : আমি শ্রেষ্ঠ অচিন্ত্য সুন্দর,
পাহাড়ে গুহায় কক্ষে স্মিতধ্বনি উচ্চারিত হোত নিরবধি।

হাওয়ার স্বপ্ন :

হাওয়াতে তোমরা হাওয়ার গন্ধে হাওয়ার গভীরে এসে
অলাতবক্ষ হিমচন্দনে নন্দিত হোক চাও,
আহা এই প্রেম আরো আলো হোত যাঁর গাঢ় আশ্লেষে
বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হাওয়ায় উড়ছে নাম।

রৌদ্র ইত্যাদির ঈর্ষা :

সংবৃত তাপ ঘুরছে কেমন   শরীরে শিরায়
আহা ঐ তাপ যদি দেহে হোত   বিচ্ছুরিত
দশটা পৃথিবী জ্বালিয়ে দিতাম   তীব্র শিখায় :
বিবেকানন্দ যদি ঐ তাপ   একটু দিত॥

স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

(স্মৃতিচারণ)

শ্রীফণীন্দ্রকুমার দেব সরকার

স্বামীজী তথা ঠাকুর সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই এত কথা শুনে আসছি যে স্বভাবতঃই তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানবার ও যে ভাবধারা প্রবাহিত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবিত করেছে সেই ভাবধারা সাধ্যমত নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করবার একটা অদম্য আগ্রহ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ছাত্রাবস্থায় উৎসবাদি উপলক্ষে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, উদ্বোধন (মায়ের বাটী), বলরাম মন্দির প্রভৃতি তীর্থস্থানস্বরূপ ছিল আমাদের কাছে এবং তখন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-এর বহু ঋষিকল্প সাধু-ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯২১ সালের শীতকালে নভেম্বর মাসে ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হওয়ার পরম সৌভাগ্য ঘটে। সেই সময়ে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজজী সদলবলে বাঙ্গালোর থেকে ভুবনেশ্বর মঠে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন মহাপুরুষজী (স্বামী শিবানন্দ মহারাজ), শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় —ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাদের বড় আদরের রামলাল দাদা—এবং আরো অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী। প্রত্যহই তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পরে ভুবনেশ্বর মঠের বিস্তৃত হল-ঘরে ভজন-কীর্তন হ'ত। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী ছাড়াও আরো বহিরাগত অনেক ভদ্রলোক ও মায়েরা সেই সময়ে ভজন-কীর্তন শুনতে আসতেন। সে যেন এক আনন্দের হাট বসে যেত।

শ্রীশ্রীমহারাজের আশ্রিত সাধু-ব্রহ্মচারী ও সদ্যকৃপা-প্রাপ্ত আমাদের মতো দু' চারজন, সুবিধা পেলেই, একান্তে তাঁর শ্রীচরণোপান্তে গিয়ে উপবিষ্ট হতাম এবং তাঁর উপদেশলাভে ধন্য হতাম। সেই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজজী সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন, যার কিছু কিছু এই লেখক টুকে রেখেছিলেন। স্বামীজী সম্বন্ধে একদিন তিনি বলেছিলেন (যতদূর সম্ভব শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের নিজের ভাষায় বলবার চেষ্টা করছি)—"মানুষ-জন্ম তো তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিলাভের জন্য। তা যদি না হ'ল মিছে বেঁচে থেকে লাভ কি? পশুর মতো খেয়ে ঘুমিয়ে কতকগুলো ছানাপোনা নিয়ে থাকবার জন্য এ জীবন নয়। নরশরীরে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। এইটি বোঝবার ধারণ করবার বিশেষ চেষ্টা কর। শুনিস-নি ঠাকুরের ছেলেরা সত্য উপলব্ধি করবার জন্য কী কঠোর সাধনা করেছেন। তাঁরা জ্বলন্ত আগুন দেখেছেন, কাজেই তাঁরা যতটা পেরেছেন ততটা তোরা পারবি না। তোদের পক্ষে তাঁর স্মরণ-মননের সুবিধা হবে বলে স্বামীজী প্রাণ-পাত ক'রে গেছেন। আহা, তোদের সুবিধা করবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে—over-exerciseএর দরুন তাঁর life এত কমে গেল! কি ভালবাসা তাঁর ছিল! তোরা নেমকহারাম হসনি। বাঙলার উপরে তাঁর খুব আশা ছিল। Young Bengal তোরা, তোদের উপর তিনি Trust করে দিয়ে গেছেন। বিশ্বাসঘাতক হসনি। ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ হয়েছেন। তাঁর উপদেশ, তাঁর কথা—ঠাকুরের কথা বলে মনে করবি। ঠাকুর এত বড় ছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে বোঝা শক্ত। স্বামীজী সাধারণ মানুষের উপযোগী ক'রে সর্বসাধারণের সমক্ষে তাঁকে ধরেছেন। যে কেহ ভাগ্যবান, তাকে এই পতাকার নীচে আসতে হ'বে। স্বামীজীর বই ভাল ক'রে পড়বি। (সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি) যেখানে বুঝতে না পারবি সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) প্রভৃতির কাছ থেকে বুঝে নিবি। স্বামীজী সাধারণের উপযোগী ক'রে

ঠাকুরের ভাব প্রচার করেছেন। তাঁর ভাব না নিয়ে ঠাকুরের ভাব ধরতে যাওয়া পাগলামি, স্বামীজীর বই ও ঠাকুরের উপদেশ খুব ক'রে পড়। খুব ধ্যান জপ কর।"

তারপর বহু বৎসর অতীত হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার ক'রে তাঁদের বহু ত্যাগী সন্তান একে একে তিরোহিত হয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী ও ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী আজ সারা জগতে উদ্দীপনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন বৎসরে আমাদের হিসাব নিকাশ করবার একটা সময় ও সুযোগ এসেছে। স্বামীজীর আদর্শ ছিল ত্যাগ। তিনি বলেছেন ত্যাগই শক্তি। তিনি ছিলেন ত্যাগের মূর্ত আদর্শ। এখন মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে আমরা, তাঁর স্বদেশবাসীরা, সেই ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'তে পেরেছি কি? জন্মভূমিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবতা, একথা বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' স্বামীজী প্রবর্তিত এই মানুষ-গড়ার কাজে তাঁর শত শত ত্যাগী সন্তান জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বামীজী বলতেন, আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান, চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা বিস্তার। সুতরাং মানুষ গড়তে হলে চাই সেবা ও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া। "যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হচ্ছে, উত্তমরূপে খেতে পাচ্ছে, ততদিন আমাদিগকে তাদের জন্য কাজ অবশ্য করতে হবে।" দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং সেইটিই আমাদের অবনতির একটা কারণ। এই জাতীয় অবনতি রোধ করতে হ'লে আমাদের যে পরিমাণ চেষ্টা ও উদ্যমের বিশেষ প্রয়োজন, আজ আমাদের মধ্যে তার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

যতই শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শ আমরা আলোচনা করছি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশমতো যতই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী ও স্বামীজীর অমূল্য গ্রন্থরাজি সাধ্যমতো পড়বার চেষ্টা করছি, ততই এই সত্য গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে যে আমরা এখনো ঠিক ঠিক ভাবে তাঁদের বুঝতে সমর্থ হইনি। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে নব মূল্যায়নের দিন এসেছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা তাঁদের প্রদর্শিত পন্থা থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। সুতরাং এখন আমাদের কর্তব্য শুধু নিজেদের ত্রুটি ও বিচ্যুতির সংশোধন নয়, পরন্তু আরো গভীরভাবে স্বামীজীর বাণী অনুশীলন ক'রে দেশ ও সমাজকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা। ভারতের নেতৃবৃন্দ, যাঁরা আজ স্বাধীন ভারতের কর্ণধার, আজ এই ব্রত তাঁদের গ্রহণ করতে হ'বে। বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে গেছেন, 'আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ভারতমাতার সেবা; ইনিই একমাত্র জাগ্রত দেবতা, আমাদের জাতি ও সমাজের মধ্যে ইনিই বিরাজিত; তাঁকে ছেড়ে অপর বৃথা দেবতার অন্বেষণে কেন আমরা ঘুরে বেড়াব?' তাই তিনি যে আশার বাণী আমাদের শুনিয়ে গেছেন প্রতিনিয়ত সেই বাণীই যেন আমাদের আশা ও উদ্দীপনা দান করে,—"নিজের উপরে কখনো বিশ্বাস হারাইও না, জগতে তুমি সব করিতে পার। কখনও নিজেকে দুর্বল ভাবিও না, সব শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমি তোমার অদৃষ্টের সৃজন কর্তা।"

স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা আলোচনা করবার যোগ্যতা এই নগণ্য লেখকের নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার মতোই তাঁরই অমোঘ বাণী উদ্ধৃত ক'রে আজ তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। উপসংহারে বলি, "বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ", আর

"মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।"

কলম্বো — ১৮৯৭

"বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

—কলম্বো বক্তৃতা

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

মাদ্রাজ — ১৮৯৭

দণ্ডায়মান (বাম হইতে) : জনৈক মাদ্রাজী ভক্ত, গুড্‌উইন, এম. এন. ব্যানার্জী।

চেয়ারে বসা (বাম হইতে) : তারাপদ (জনৈক সাধু), স্বামী শিবানন্দ, স্বামীজী, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ. স্বামী সদানন্দ।

নীচে বসা (বাম হইতে) : আলাসিঙ্গা পেরুমল, আর. এ. কৃষ্ণচারী, জি. জি. নরসিংহচারী, বলাই, কিডি।

"স্বামীজী সুগভীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবরাশি প্রলয়ান্তকাল পর্যন্ত সততই প্রতিধ্বনিত হইবে।"

— প্যাসিফিক বেদান্তিন

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

ভারত-ভাস্কর বিবেকানন্দ

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

॥ সূচনা-সঙ্গীত ॥

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্ ॥
কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো! কটিতট-কৌপীনবস্তম্।
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত দিঙ্মুখ-প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্যম্ ॥
ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষম্
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্ ॥

॥ সূত্রধার ॥

কোটীসূর্যকরোদ্ভাসিত বেদতনু বীর বিবেকানন্দ। নিবেদন করি, ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ের আভূমি-লুণ্ঠিত সহস্র প্রণাম। হে জগজ্জয়ী মহাচার্য, জ্ঞাপন করি তোমার উদ্দেশে স্তুতি-ঘন অন্তরের পরম শ্রদ্ধার্ঘ।

সপ্তর্ষিলোকে জ্যোতিঃমণ্ডলের ধ্যান-নিমগ্ন হে নর-ঋষি! দেদীপ্যমান তোমার জ্যোতিচ্ছটা অবতীর্ণ হল এক অতি শুভলগ্নে শতাব্দীর অপর পারে। অমর উষালোক নামল মোহান্ধকার মরলোকে। সে বিচ্ছুরিত দিব্যবিভায় আলোকিত হল কাল, উজ্জীবিত হল দেশ, সমুদ্ভাসিত হল বিশ্ব। শতাব্দীর সমাপ্তিকূলে উৎসারিত এই জ্যোতিঃধারায় নিত্য অবগাহন করেছি আমরা—এই যুগ-সূর্য অধ্যাত্ম-প্রতিভার স্নেহধন্য উত্তরসূরিগণ। বস্তুত আচার-প্রপীড়িত পথভ্রষ্ট দুর্গত বিশ্বমানব দিন গুনছিল বুঝি এমনই এক দিব্য আবির্ভাবের অধীর প্রত্যাশায়। জীব-দুঃখ-কাতর বিশ্বত্রাণ এই মহাবীর্যকে তাই বরণ করে নিল তারা আশা-নন্দিত অন্তরের মুখর বন্দনায়।

॥ গীত ॥

এ মোহ-সঙ্কটে যোগীন্দ্র-সুন্দর ধ্বনিলে দুন্দুভি ঘোর স্বনে—
মোহার্ত বিহ্বল এ বিশ্ব বন্দিল নিখিল-মঙ্গল-নিরঞ্জনে।
হে প্রেম-নির্ঝর, জীবন-বল্লভ,
পুরুষ ভাস্বর দেবর্ষি-দুর্লভ,
বাণী প্রকম্পিল সুচির নির্ভয়, হে বীর সন্ন্যাসী, হৃদয়ে অশনি।
ও দিব্য দুর্জয় অমর্ত্য সাধনা
অনন্ত ঘোষিছে অনন্ত মহিমা,
পাবক-বিভা ছুটে ত্রিলোক নন্দিয়া,
তৃষার্ত ধরণী রহিছে বন্দিয়া—
গাহিছ অভীরভীঃ হে সত্য সাধক
মোহের প্রাকার ভেদিয়া ভাঙিয়া।

॥ সূত্রধার ॥

দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে চলেছে দিক্‌ভ্রান্ত আত্মসন্ধানী যুবক। কি অমোঘ সে আকর্ষণ! হৃদয় ডেকেছে হৃদয়কে। দাঁড়াল এসে আকুল আশ্বাসে যুগাবতার প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চরণতলে। দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ তার বুদ্ধি-চেতনা—উদ্বেল তার চিত্ত-সমুদ্র। ঈশ্বরকে কি দেখেছেন আপনি?—সুচির-কালের সংশয়-কণ্টকিত প্রত্যুত্তরবিহীন প্রশ্ন। উত্তর আসে কিন্তু। শুধু সহজ নয়, অবিচলিত প্রত্যয়ে স্থির অকপট প্রত্যুত্তর।—হাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি তার চেয়েও স্পষ্ট। চাস ত দেখাতেও পারি।—স্তম্ভিত হয় বিদ্যা-বিভ্রান্ত জ্যোতিষ্মান যুবক—বিচার-সর্বস্ব তথ্যমাত্র এ ত নয়, একেবারে পূর্ণ-পরীক্ষিত পরমার্থ-তত্ত্ব। আত্মসমর্পণ করে বিহ্বল নরেন্দ্র। টেনে নেন স্নেহক্রোড়ে যুগাবতার। অধ্যাত্ম-লীলার এ এক অপরূপ জীবন-নাট্য। অলোকসামান্য দুই যোগজীবনের ভাগবতী মুক্ত সঙ্গম।

॥ গীত ॥

নিরুপম রূপ মুক্ত স্বরূপ
তপ-জ্যোতিঃ-নির্ঝর,

দেবর্ষি-ধন বিশ্ব-পাবন
অমৃত বেদঙ্কর।
শান্ত সুধীর হৃদয়-সিন্ধু,
ধ্যান-সুন্দর বদন-ইন্দু,
সৌম্য সুঠাম তনু অভিরাম
নয়ন মুগ্ধকর।
গুরুপদে হিয়া সতত লগ্ন,
বিভোর আত্মানন্দে মগ্ন,
নির্জিত-কাম জিত-সংগ্রাম
প্রমূর্ত শঙ্কর।

॥ সূত্রধার ॥

শিষ্য জানাল গুরুর কাছে আপন অন্তরের গূঢ় অভীপ্সা—চাই পরা মুক্তি। নির্বিকল্প ধ্যান-সমুদ্রে নিত্য দিবানিশি মগ্ন হয়ে থাকা। ভর্ৎসনা এল গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদের সুরে—বটগাছের মত হবে যে প্রচ্ছায়শাখা বনস্পতি—সুশীতল আশ্রয় দেবে শত শত আর্তকে—সংসার-ক্লিষ্ট তাপদগ্ধ শত শত অভাজনকে শোনাবে আশা উদ্দীপিত নবজীবন-বাণী—সে কিনা আপন মুক্তি-ভাবনায় অস্থির-চিত্ত! এ ত মাত্র আত্মসুখ-চেতনা—স্বার্থপরতারই নামান্তর। মন্ত্র পেল শিষ্য—অধ্যাত্মজীবনের পরম ধ্যানমন্ত্র,—ত্যাগ ও সেবা। প্রেম, উদারতা, সত্যানুরাগ। সুগভীর শ্রদ্ধা, অগ্নিময় বিশ্বাস, নিঃশেষ আত্মাহুতি।

॥ আবৃত্তি ॥

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখসুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম।
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়—
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজি ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

॥ সূত্রধার ॥

মহীরুহের আশ্রয়চ্ছায়া! সংসারজীবনের তপ্ততনু আর্তজনের ব্যথায় ও মহানুভব বিশাল হৃদয়ের কি না দুঃসহ মর্মবেদনা—করুণা-ক্লিষ্ট কল্যাণব্রত সুগভীর অন্তরের কি না অহরহ রক্তমোক্ষণ! ভারতের অগণিত নিপীড়িত মানুষের বেদনায় লোকোত্তর আচার্য শোনালেন মুক্তি-মন্ত্র। ডাক দিলেন দেশের ভাবী-শক্তি যুবক সম্প্রদায়কে—ভাগ্য-বিড়ম্বিত আপামর জন-জীবনকে। বললেন,—"বীর হ—সর্বদা বল 'অভীঃ' 'অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার।" তাই "শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবন-পাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।" জাতি পেল নূতন করে দীক্ষা দীপ্তিমান এই যুগ-নায়কের কাছে আত্মবোধির বীজমন্ত্রে—"অভীঃ" চেতনায়।

॥ আবৃত্তি ॥

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ, ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া

ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহাদের নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে।...বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়ে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

॥ গীত ॥

আমরা হব বীর,—
ডাক শুনেছি অভয়বাণী
কণ্ঠে স্বামীজীর।
বিশ্বপ্রাণে লেগেছে ঢেউ,
রুদ্ধদ্বারে রব না কেউ,
চোখ মেলে চাও, নিদ ভাঙে ওই
দীর্ঘ রজনীর।
আর্ত-দীন-দুঃখীসেবায়—
যাক ভেসে এ প্রাণ,
চরম যে ত্যাগ সেই পূজা মার
সেই ত বলিদান।
দাও আলো দাও জীবন ছেয়ে—
দূর চলি পথ তোমায় চেয়ে,—
জলব বুকে দীপ্ত তেজে
পুণ্যা জননীর।

॥ সূত্রধার ॥

দৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে, ভারতের চিরকল্যাণকর ভৌম আদর্শে জাতিকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব বহন করেছেন বীর্য-বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। এই বিশ্বাসহীন জড়প্রায় ভারতীয় জনসমাজকে—এই শঙ্কা-কাতর আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, বীর্যে, বিশ্বাসে, কর্মশীলতায় ও চরিত্রবলে পথ-নির্দেশ করলেন তিনি মহামহিমান্বিত যুগাচার্যরূপে। কম্বুকণ্ঠে বারংবার উচ্চারণ করে শোনালেন গীতার শ্রীবাণী—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।

প্রচণ্ড আশ্বাসের সুরে আহ্বান ধ্বনিত হল দেশের প্রতিটি নরনারীর হৃদয়-কন্দরে—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।

সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে লোককল্যাণকামী এই ঐশী পুরুষসিংহ স্মরণ করিয়ে দিলেন জগদ্বাসীকে—

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চির্দ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

॥ আবৃত্তি ॥

সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, অতি দুর্বল—তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায় হইয়াছ। কে আমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য।

* * *

মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য করিতে সক্ষম হয়? বীর্য! বীর্যই সাধুত্ব—দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা 'অভীঃ'! যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'! কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই অভীঃ এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে; কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ।

* * *

এখন আর আমাদের কোমল ভাব অবলম্বন করিবার সময় নাই।…আমাদের দেশের পক্ষেও এক্ষণে প্রয়োজন লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া, এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতলতলে যাইতে হয়, যদিও সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক ; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সাধন করা যাইতে পারে।…

যদি গৃহে অন্ধকার থাকে, তবে সর্বদা 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস।…এস, আমরা বলিতে থাকি, আমরা সৎ-স্বরূপ, ব্রহ্ম-সৎস্বরূপ, আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্—এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া যাই, চল।

॥ আবৃত্তি ॥

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ ॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

॥ সূত্রধার ॥

বর্তমানকালের শিক্ষার দুর্দশা দর্শনে পীড়িত-আত্মা যুগ-গুরু নির্দেশ করেন প্রকৃত শিক্ষার সংজ্ঞা—"কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সেকি আবার শিক্ষা ? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।" বলেন জ্ঞান-সমৃদ্ধ আচার্য, "শিক্ষা—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" বস্তুতঃ কি সুবৃহৎ পার্থক্য বর্তমান শিক্ষাধারা ও স্বামীজী-নির্ধারিত শিক্ষাতত্ত্বে! সত্যকার শিক্ষার অভাবে যাপন করেছে মানুষ মানুষেতর জীবন। কোথায় তার শারীরিক বলিষ্ঠতা, কোথায় তার মানসিক ঋজুতা, কোথায়ই বা তার চারিত্রিক বজ্রকাঠিন্য ?

॥ আবৃত্তি ॥

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর ; আলোক, আলোক লইয়া এস। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক, যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পৌঁছায় ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্য শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর ; ধনীদের নিকট আরও অধিক আলো লইয়া এস ; কারণ দরিদ্রের অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের

নিকট আলো লইয়া এস ; শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলোক ; কারণ, আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইরূপ সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু সেই প্রভু করিবেন।

* * * *

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জালিয়া দাও আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না তখনই পার হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিবে না।...কার্যের আরম্ভ সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর, নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।

॥ গীত ॥

ওঠো জাগো এগিয়ে চল
হারিও না আর দিক,
ডাক দিয়েছেন জগজ্জয়ী
সন্ন্যাসী নির্ভীক।

দুর্বলেরা আছে মরে',
ভয়েরে জয় কর ওরে,
মুক্ত প্রাণের দীপ্তানলে
জীবন জেলে নিক।

দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে
মহামনের ডাক,
আত্মাহুতির মন্ত্র এ যে—
হৃদয় ভরে রাখ।

ছোট বড় নাই কেহ নাই,
দুঃখী অধম আমারি ভাই—
বিশ্বসেবাব্রতে যেন
লক্ষ্য রহে ঠিক।

॥ সূত্রধার ॥

ভারতের সর্বাত্মক কল্যাণ-সাধনে একান্তভাবে নিয়োজিতচিত্ত ভারতাত্মা বিবেকানন্দ। ভারতের কল্যাণ সমগ্র বিশ্বেরই কল্যাণ—ধ্রুব জানতেন এ ভবিষ্য-দর্শী তাপস। যে অধ্যাত্ম-বৈভবের উত্তরাধিকার লাভ করেছে ভারত—গ্রহণ করতেই হবে তা কালে জগৎকে। নইলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন করে? আশ্বাস-গভীর তাঁরই কথায়,—"যে ধনভাণ্ডার আমরা পূর্ব-পুরুষদের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।" অতএব মাতৃভূমি ভারতের বর্তমান দুরবস্থা এই যোগোদ্দীপ্ত মহা-তাপসকে একান্তভাবে করেছে বেদন-ক্লিষ্ট। সু-উচ্চ হিমালয় থেকে প্রত্যন্তভূমি কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের বনে প্রান্তরে, পর্বতে উপত্যকায়, গ্রামে জনপদে, কুটিরে প্রাসাদে সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী ধ্যানচিত্ত পরিব্রাজক এই বিশাল দেশখণ্ডকে জানতে, বুঝতে, সম্যকভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে। যেমন দেখেছেন তার বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদ, তেমনি বেদনাহত হৃদয়ে লক্ষ্য করেছেন তার সমাজব্যাপী কপটতা, ক্রূরতা, অত্যাচার, অজ্ঞতা ও সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য। তাই বুঝি ভারতবর্ষের কঠিন দুর্ভাগ্যের শিরে অহরহ বর্ষিত হয়েছে অন্তঃসলিলা তাঁর অপার করুণার ধারা। বেরিয়ে এসেছে বাণী বুক ভেঙে,—

"দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।"

॥ আবৃত্তি ॥

ভারতের চিরপতিত বিশকোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের

ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্ত-মোক্ষণ হয়। তা না হলে সে দুরাত্মা। এরূপ ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী মনে করি, হতভাগা বলি।

॥ গীত ॥

কণ্ঠে ধ্বনিছে অভীরভীঃ রব
ত্যাগের কেতন হাতে,
চল-বিদ্যুৎ ঝলিছে কান্তি
সজল পূর্ণিমাতে।

কহে উচ্চারি—"আছে ধন আছে,
আমি আসিয়াছি, এস মোর পাছে,
অমৃত-তনয়, আর ঘুম নয়
এ মোহ-অন্ধরাতে।

"জাগিয়াছে দিবা, জাগিবে না বীর?
ঘুচাবে কে তাপ মহা ধরণীর?
নাশো নাশো ভয়, মিছা সংশয়,
অমিত বীর্যঘাতে।
"শিব-চেতনায় এ জীব-জীবন
আছে উদ্ভাসি, হানো বন্ধন—
আনো ভরি প্রাণ মুক্তকিরণ
এ ঘন তমিস্রাতে।

॥ সূত্রধার ॥

পরমকল্যাণাশ্রয় স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন মাতৃজাতিকে অপূর্ব দৈবী মহিমায়। বললেন বেদান্তবীর স্ফুটকণ্ঠে, "আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ উহা তেমনি লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই।" বললেন দিব্যদৃষ্টি যুগ-সারথি, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" বললেন গুরুগতপ্রাণ অধ্যাত্মচিত্ত শিষ্য, "সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারী-ভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।" বস্তুত বারংবার ধ্বনিত হয়েছে শ্রদ্ধাপ্লুত তাঁর উদার কণ্ঠে অনন্ত মাতৃ-মহিমা। ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজে যে গৌরবময় আসন গ্রহণ করে আছে ভারতীয় নারী স্মরণাতীত কাল থেকে, তার কীর্তনগাথায় উচ্ছল হয়ে উঠেছেন মহাসাধক। ভারতের মর্মেতিহাসের সেই দৃষ্টি-আলোয় নির্ধারণ করে গেছেন তিনি ভারতীয় নারীর অগ্রগতির সুনিশ্চিত ধ্রুব পথ।

॥ আবৃত্তি ॥

মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধতা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালেই ঐরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যবিশুদ্ধ-স্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের এমনকি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা-চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে।…ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি-বিকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

॥ গীত ॥

বিবেকানন্দ জয়।
তাপস-প্রবর মহাযোগিবর
জয় হে জ্যোতির্ময়।

মোহ-মর্দন মূঢ়তা-নাশন,
জ্ঞান-ভাস্কর তেজ-হুতাশন,

কাম-কাঞ্চন-কলুষ-শাসন
জয় চির-নির্ভয়।

ত্যাগী শঙ্কর করুণা-সাগর,
জীব-কল্যাণে দ্রব অন্তর,
হে যুগ-সাধক প্রেম-সুন্দর
অনন্য আশ্রয়।

আর্তের চির আর্তি-হরণ
নিখিল-মানব-পরম-শরণ,
বজ্র-স্বননে কর বিঘোষণ
মন্ত্র সে দুর্জয়।

॥ সূত্রধার ॥

বীর্যসাধক বিবেকানন্দ দীক্ষা দিলেন বিশ্বকে দুরূহ শক্তি-মন্ত্রে—বিশেষ করে পরপদদলিত দুর্দিন-পীড়িত ভারতকে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে তার যে মহা দুর্ভাগ্য তা থেকে চাই তার পূর্ণ মুক্তি। আচারের নামে ধর্ম সমাজজীবনে এনেছে আলস্য, খলতা ও ব্যভিচার; সংস্কারের প্রাচীর হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ; আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে মানবতার চলেছে নিত্য বলিদান; প্রভুত্বের মোহে বিচার হয়েছে ধিক্কৃত। দারিদ্র্য, জড়তা, ঈর্ষাপরায়ণতা, দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা ও সর্বোপরি প্রবল স্বার্থপরতা সমাজজীবনে করেছে অনুপ্রবেশ—জীবন হয়েছে বিভ্রান্ত, আদর্শ হয়েছে বিড়ম্বিত। ডাক দিয়েছেন নরকেশরী—জাগতে হবে সকলকে সিংহপৌরুষে। লাভ করতে হবে আত্মশক্তি—আধ্যাত্মিক অন্তর্লোকে সাগ্নিক মন্ত্রসাধনায়। ভবিষ্যতের দূর মর্মদেশে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিক্ষেপ করে উদ্বুদ্ধ করলেন তাই দেশচিত্তকে স্থিতপ্রজ্ঞ ভারত-পুরুষ বজ্রনির্ঘোষে।

॥ আবৃত্তি ॥

আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া জননী মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তুমি কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে।

॥ সূত্রধার ॥

কণ্ঠে প্রচণ্ড আশার বাণী নিয়ে উন্মুখ আবেগে ডাক দিলেন অমিতশক্তি দীপ্তোজ্জ্বল তাপস হীনবীর্য কর্তব্যবিমুখ দেশবাসীকে—ডাক দিলেন সকল জড়তা-ক্লিষ্ট প্রাণকে চির-গরীয়সী মাতৃভূমির গৌরবসাধনে চূড়ান্ত আত্মনিবেদনে।

॥ আবৃত্তি ॥

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কী ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া! এই ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। প্রত্যুত, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের জয় হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না। আগাইয়া যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

॥ গীত ॥

মানুষ হতে হবে এবার
ঘুচাও মোহ ঘোর,
সুপ্তি ভাঙো, চোখ মেলে চাও,
আঁধার হল ভোর।

গর্জে তোমার তূর্যবাণী,
ধরেছ হাত বজ্রপাণি,
চলতে হবে দৃপ্ত মনে
কি আছে ভয় তোর?

পুণ্যভূমি মুক্তাকাশে
দীপ্ত দিবাকর,
মূর্ত তেজে সন্ন্যাসী বীর,
বিরাজো ভাস্বর।

জয়ধ্বজা ধরি তুলে
শতাব্দীর এ ভাঙা কূলে—
তোমার বরাভয়ে ধরা
বীর্যে সুকঠোর।

॥ সূত্রধার ॥

পুণ্যভূমি ভারতের স্তবগানে মুখর হয়েছেন মহাযোগী। এ যেন তাঁর হৃদয়-নিঃসৃত অমৃতময় কাব্যবাণী। মহাযোগী যেন মহাকবি! সুপ্রাচীন ভারতের মর্মান্তঃশায়ী নিগূঢ় রূপটি উদ্ঘাটন করেছেন ভাব-গাঢ় অপূর্ব নিপুণতায়—দুকূলপ্লাবী স্বদেশপ্রেমে উচ্ছলিত হয়েছে চিত্ত—ডাক দিয়েছেন সমাজের সকল শ্রেণীর সকল স্বজনকে অমিতবীর্যে—স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানবৃদ্ধ শাশ্বত ভারতের মহৈশ্বর্যময় অতীত গৌরব—প্রার্থনা করেছেন একাত্মময় ভ্রাতৃবোধে সকলের হয়ে সকলেরই কল্যাণ। মুক্তমানস যুগ-নায়ক বিবেকানন্দের এই বুঝি কালজয়ী অমর বাণী-মূর্তি—সতত-সুনিবিড় কল্যাণ-কামনায়, একাগ্রচিত্ত মহাধ্যানে, জ্যোতিঃসুন্দর ভাব মুখে।

॥ আবৃত্তি ॥

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারত-বাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

॥ গীত ॥

ভারত-হৃদি-মন্থন-ধন
জাগ্রত মহাকাল,
ব্রহ্ম-বাদন ঋষি বরেন্দ্র
উন্নত জ্যোতি-ভাল।

সাধন-পূত জীবন-ছন্দ,
নাশন-তাপ-জড়তা-বন্ধ,
যোগিবর বীর বিবেকানন্দ
দীপ্ত মরীচিমাল।

প্রেমঘন মহাসাধক শুদ্ধ,
পরাজ্ঞানময় মুক্ত বুদ্ধ,
হানো যুগ যুগ যা আছে রুদ্ধ
দুঃসহ জঞ্জাল।

॥ সূত্রধার ॥

কোটীভানুকরদীপ্ত তপঃকান্তি হে মহাতেজা, কখন তুমি ধ্যান-গম্ভীর, ব্রহ্মরসাস্বাদে সমাহিতচিত্ত, সতত আবার মহনীয় মানবীয় রূপে জীবপ্রেমকাতর বিশ্বসেবা-ব্রতী। হে পূর্ণগৌরব ভারত-ভাস্কর, তোমার দিব্যদ্যুতি-বিধৌত এই শতাব্দ-সৈকতে নিবেদন করি তোমাকে ভক্তি-পরিপ্লুত অন্তরের বিনম্র কোটী প্রণাম।

॥ সমাপ্তি-সঙ্গীত ॥

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী।
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম,
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥

মদগর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ-গ্লানি।
নবভারতে আনিলে তুমি নববেদ,
মুছে দিলে জাতিধর্মের ভেদ,
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি॥

স্মরণিকা

[ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ কর্তৃক সংকলিত]

॥ একাত্মানুভূতি ॥

দার্জিলিং-এ জনৈক ভুটিয়া নারীকে পদস্খলিতা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্বামীজী এরূপ ব্যথা পেয়েছিলেন যে ঐ ব্যথিতা নারীর দেহের ঠিক যে স্থানে যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাঁরও শরীরে ঠিক সেই স্থানেই বেদনা অনুভূত হচ্ছিল। বিবেকানন্দ সোসাইটীর সুরেন্দ্রনাথ সেন সে সময় তাঁর সহযাত্রী।

*　　*　　*

॥ ব্যথীর ব্যথা ॥

"আমি তাঁহার (স্বামীজীর) সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি বারান্দায় (বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটীতে) সিংহের মত পায়চারি করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিলেন না।…মীরাবাঈ-এর একটি বিখ্যাত গান গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। অশ্রুতে তাঁহার দুইচক্ষু ভরিয়া গেল। তিনি থামিয়া আলিসার উপর ভর দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইল। বার বার করিয়া বলিলেন : 'ওরে আমার দুঃখের কথা কেউ বোঝে না।' আবার বলিলেন, 'দুঃখ যে পেয়েছে, দুখ কি সে-ই বোঝে।'

"একটি তীরের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।…তারপর যেন চকিতে বুঝিলাম। তাঁহার মধ্যে যে করুণা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছিল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগলিত হইত। দুনিয়ার লোকে তাহা জানিত না।"

"এই যে রক্তধারা অশ্রুধারা হইয়া বিগলিত লইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে মনে করেন? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁহার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করিবে। এই বীরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দিয়া পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিবেন।"

—স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথা

*　　*　　*

॥ বহুরূপী ॥

সমন্বয়াচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ছিল সকল ভাবের সকল পথের মিলনক্ষেত্র।

মিস্ জোসেফিন্ ম্যাক্‌লাউড একদিন নিবেদিতাকে বলেন, "স্বামীজী মূর্তিমান শক্তি।"

নিবেদিতা জবাবে বলেন, "স্বামীজী মূর্তিমান স্নেহ।"

ম্যাকলাউড : "আমি তাহা কখনো অনুভব করি নাই।"

নিবেদিতা : "কারণ, সে-রূপ আপনাকে স্বামীজী দেখান নাই।"

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি এবং কোন্ পথে সে ভগবান লাভ করিতে পারে, সেই অনুসারেই স্বামীজী তাহার সহিত ব্যবহার করিতেন।

* * *

॥ বীর দম্পতি ॥

স্বামী বিবেকানন্দের ভাব, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব অভিভূত করে ফেলেছিল লণ্ডনের একটি ধর্মপ্রাণ দম্পতিকে। লণ্ডনে একদিন এক বক্তৃতা শুনে বের হয়ে আসবার সময় মিস্টার সেভিয়ার মিস্ ম্যাকলাউডকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি এই যুবককে জানেন? তাঁকে যেমন মনে হয়, তিনি কি তেমন?"

মিস্ ম্যাকলাউড : "হ্যাঁ।"

মিষ্টার সেভিয়ার : "যদি তাই হয়, তবে তাঁর অনুসরণ করে ভগবানের সন্ধান করা উচিত।

তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "তুমি কি আমাকে স্বামীজীর শিষ্য হতে দেবে?" স্ত্রী বললেন "হ্যাঁ, দেবো।" তারপর তিনিও স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমাকে স্বামীজীর শিষ্য হতে দেবে?" স্বামী সস্নেহ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কি জানি।"

যে কথা সেই কাজ। বীরদম্পতি স্বদেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন স্বামীজীর পিছু। স্বামীজীর নির্দেশমত নিজেদের অর্থে ও চেষ্টায় হিমালয়ের এক দুর্গমস্থানে গড়ে তুললেন—মায়াবতী 'অদ্বৈত আশ্রম'। স্বামীজীকে তাঁরা আপন সন্তানের মত দেখতেন। স্বামীজীর এবং স্বামীর উভয়ের শরীরত্যাগের পরেও দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন মাদার সেভিয়ার। ঐ দুর্গম স্থানে সদা অপরের সেবায় এবং শিশুদের শিক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন। পরবর্তীকালে মিস্ ম্যাকলাউড তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার একঘেয়ে লাগে না?" মাদার সেভিয়ার জবাবে বলেছিলেন, "আমি শুধু তাঁ-র (বিবেকানন্দের) কথা ভাবি।"

* * *

॥ খ্রীষ্টের ঘনিষ্ঠ কেউ! ॥

সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে স্বামীজী একটি পাহাড়ের উপর একটি ছোট উপাসনা-মন্দিরে যান। সেখানে তিনি ফুল তুলিয়া মিসেস সেভিয়ারের হাত দিয়া মেরীর পায়ে দেন, বলেন : "ইনিও মা।"

পরে তাঁহার কোন এক শিষ্য খেয়ালবশতঃ তাঁহাকে ম্যাডোনার মূর্তি আনিয়া দেন ও মূর্তিকে আশীর্বাদ করিতে বলেন। বিবেকানন্দ শ্রদ্ধায় নত হইয়া আশীর্বাদ করিতে অস্বীকার করেন এবং ভক্তিভরে শিশু যীশুর মূর্তির পা ছুঁইয়া বলেন : "আমি পারিলে চোখের জল দিয়া নয়, বুকের রক্ত দিয়া তাঁহার পা ধুয়াইয়া দিতাম।"

* * *

॥ ইনি কি সেই বি—? ॥

ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসীদের গ্রাম্য জীবনের মতোই স্বামীজী বেলুড়মঠে গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। উদ্যানে ও পশুশালায় তাঁহার কাজ চলিল। 'শকুন্তলা' নাটকে বর্ণিত ঋষিদের মতো তাঁহার

প্রিয় জীবজন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল। 'ভগা' কুকুর, 'হাসি' ছাগী, 'মঠরু' ছাগশিশু এবং একটি ছাগল, একটি বক। কতকগুলি হাঁস, কতকগুলি গরু ও ভেড়া। ছাগশিশুটার গলায় অনেকগুলি ঘণ্টি বাঁধা ছিল। তাহাকে লইয়া তিনি শিশুর মত খেলিতেন। জীবজন্তুগুলিও তাঁহাকে ভালবাসিত। ছোট ছাগলছানা মঠরু পূর্বজন্মে তাঁহার আত্মীয় ছিল, তিনি এইরূপ ভান করিতেন। মঠরু তাঁহার ঘরেই ঘুমাইত। হাসিকে ছুঁইবার আগে সর্বদা তিনি তাহার অনুমতি চাহিতেন। ভগা (কুকুর) হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিত। শঙ্খ-কাঁসরঘণ্টা ধ্বনি-যোগে 'গ্রহণ' শেষ হইয়াছে ঘোষণা করা হইলে সে গঙ্গাস্নান করিত। রাজহংসের পালক উঠিয়া যাওয়ায়—উহার ক্ষতস্থানে তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেন।

একেই ত বলে বিশ্বের দরদী মানব! তাই বিস্ময় জাগে—ইনি কি সেই?

* * *

"Tit for Tat"

A Scotch Gentleman: "Well, Swamiji! What is the difference between a monk and a monkey?"

Swamiji: "Oh! Very little, just between a Scot and a Sot."

One Lady: "Who feed these idler parasites (monks)?"

Swamiji: "The same, madam, who feed the clergymen here—the ladies."

* * *

॥ 'ভেইয়া তোমরা ছিলমঠো দো' ॥

বিশ্ববিজয়ী বীর বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া ভারতাভিমুখে চলিয়াছেন। ফিরিবার পথে এডেন বন্দরে নামিয়া ইংরেজ বন্ধুদের পিছনে ফেলিয়া কিছুদূরে একজন হিন্দুস্থানী পানওয়ালাকে দেখিয়া স্বামীজী মহানন্দে তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দেন। ইতোমধ্যে তাঁহার ইংরেজ বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটি সামান্য লোকের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া মনে করিলেন এ লোকটা কে? কিন্তু যখন দেখিলেন, স্বামীজী সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঠিক বালকের মত 'ভেইয়া তোমরা ছিলমঠো দো' বলিয়া কলিকা লইয়া টানিতে টানিতে মহা স্ফূর্তিভরে ধূম ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলেন এ আর কিছু নহে, তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার একটি নিদর্শন মাত্র। সেভিয়ার সাহেব ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ও বুঝেছি, এ জন্যই বুঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।"

তাই 'ভারতবাসী আমার ভাই'—ইহা শুধু বাচনিক সত্য নহে, পরন্তু জীবনে পরীক্ষিত সত্য।

* * *

"Hombre de Dios"

"একদিন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। বোধহয়, সেদিন আমরা অতি আত্মমগ্ন হইয়া আলাপ করিতেছিলাম। একটি অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝুঁকিয়া আছে, কেহ কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে। স্বামীজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পতিত হইল। আমাদের দলের একজন মহিলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইলেন; স্বামীজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই নারিগণের সম্মুখীন হইলেন।

"স্বামীজী বলিলেন, 'হায় হতভাগ্য সন্তানগণ! বেচারীরা তাহাদের রূপের উপাসনায় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে! আহা, ইহাদের দিকে চাহিয়া দেখ।' পতিতা নারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান যীশুখ্রীষ্টের মতই স্বামীজীর চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাহারা নির্বাক ও লজ্জিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল। একজন নারী অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচ্ছদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া গদগদ কণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বলিতে লাগিল —'Hombre de Dios—Hombre de Dios'—(ঈশ্বর-জানিত লোক)। অপর একটি নারী সহসা বিস্মিত সম্ভ্রমে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিল, যেন তাহার সঙ্কুচিত আত্মা স্বামীজীর পবিত্র দৃষ্টি সহিতে পারিতেছিল না।"

—ম্যাডাম কালভের স্মৃতিকথা

* * *

॥ 'কে এই আকাশপ্রদর্শক?' ॥

দেশে এবং বিদেশে স্বামীজীর হাবভাব, চালচলন এবং চেহারার ভিতর একটা রাজকীয় ভাব, একটা বিরাট শক্তির স্ফুরণ দেখা যেত। কতকগুলি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি:

"আমি সেই ভয়ংকর চক্ষু দুইটির পিছু লইলাম"—স্বামী সদানন্দ

"একদিন এক বক্তৃতার শেষে তাঁর (স্বামীজীর) সঙ্গে পথে চলতে চলতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার মনে হল তিনি এক অতিকায় পুরুষ এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর আয়তন ছাড়িয়ে গেছে। পথের লোকগুলোকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ বামনের মত। তাঁর ছিল এমনই রাজকীয় চেহারা যে পথের লোকেরা তাঁর জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত।"

—বিরজাদেবী (এডিথ এ্যালান)

"জগতে আমি মাত্র দুইজন পুরুষ মানুষ দেখিয়াছি। একজন হইতেছেন জার্মান সম্রাট কাইজার এবং দ্বিতীয়জন স্বামী বিবেকানন্দ।"

—মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড

"যদি এই পৃথিবীর মাটিতে কখনও কোনও ভগবান থাকেন তবে ইনিই তিনি।"

—মিসেস ব্লজেট

* * *

॥ প্রথম বড় দান ॥

আমেরিকায় তথাকথিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী জন ডি. রকফেলার একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের যদিও কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তবু কোনও একটি আকর্ষণে চালিত হয়ে বন্ধুর বাড়িতে সোজা চলে গেলেন এবং যে বাটলার দরজা খুলে দিল তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বাটলার স্বামীজীর অবস্থানকক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলে বিনা ঘোষণায়, রকফেলার সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন। এবং তিনি বিশেষ বিস্মিত হলেন, যখন দেখলেন, কে এসেছে তা দেখবার জন্য স্বামীজী লেখার টেবিল থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

কিছু পরে স্বামীজী মাদাম কালভেকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি রকফেলারকেও তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন, যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে-টাকা তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন তার মালিক তিনি নন, তিনি নিমিত্তমাত্র—পৃথিবীর মঙ্গল করাই তাঁর কর্তব্য—ভগবান তাঁকে সম্পদ দিয়েছেন যাতে করে তিনি মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারেন।

রকফেলার বিরক্তিতে ও অস্বস্তিতে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে, বা তাঁকে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাহস! তিক্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে আবার বিনা ঘোষণায় স্বামীজীর পাঠকক্ষে তিনি প্রবেশ করলেন এবং স্বামীজীকে পূর্ববৎ দেখে ডেস্কের উপরে একটি কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যার মধ্যে জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থদানের পরিকল্পনা লিখিত আছে।

'আপনার কথামতই কাজ হয়েছে, খুশী হলেন তো! আশা করি আমাকে আপনি ধন্যবাদ দেবেন—' রকফেলার বললেন।

স্বামীজী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। তারপর কাগজটি নিয়ে শান্তভাবে পড়ে বললেন, 'আপনার আমাকেই ধন্যবাদ জানানো উচিত।' এইখানে শেষ। এবং এইটেই জনকল্যাণে রকফেলারের প্রথম দান।

পরবর্তীকালে রকফেলার স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করেই বলেছিলেন, "অর্থোপার্জন ছাড়াও জীবনের অন্য অর্থ আছে। অর্থ যেন ন্যাসস্বরূপ, অসৎভাবে তার ব্যবহারে পাপ হয়। নিজের জীবন-শেষের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল অপরের জন্য বাঁচা। আমি সেই চেষ্টাই করছি।" (বি. এফ. উইঙ্কলম্যান রচিত জন ডি. রকফেলার)

—*Swami Vivekananda In America :*
New Discoveries—M. L. Burke

কলিকাতা — ১৮৯৭

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

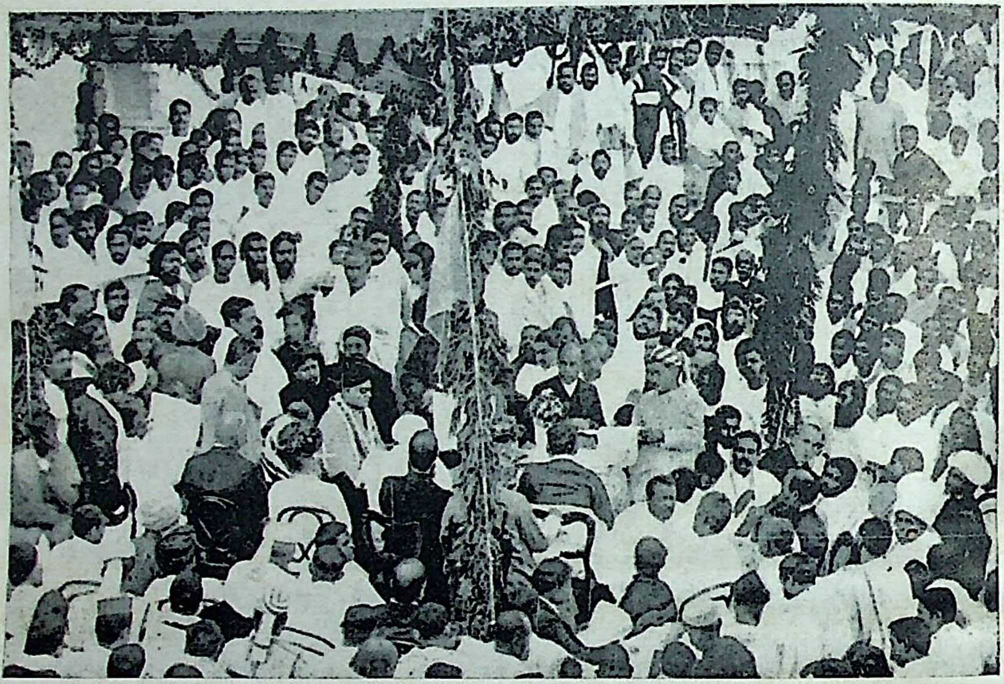

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৮৯৭
(কলিকাতা অভিনন্দন)

"আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর তাহার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

যুগাচার্য প্রসঙ্গে যুগ-মনীষী

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষকে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব ও পশ্চিম)

আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বললেন, তোমাদের ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলবে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে—আঙুলকে নয়।

—রবীন্দ্রনাথ

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়। ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।

—রবীন্দ্রনাথ

(স্বামী অশোকানন্দজীকে লিখিত পত্র)

আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' এছাড়া তিনি আরও শত মুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।

—কুমুদবন্ধু সেন

('উদ্বোধনের জয়যাত্রা', উদ্বোধন, স্বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৪)

যদি ভারতবর্ষকে জানিতে চাও, তবে বিবেকানন্দের অনুশীলন কর। তাঁহার মধ্যে সকল কিছুই ইতিবোধক, নেতিবোধক কিছুই নাই।

—রবীন্দ্রনাথ

স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।

—শ্রীঅরবিন্দ

বিবেকানন্দ ছিলেন আত্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ ; নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজো প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কী ভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মুখী উর্ধ্বায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আর আমরা বলি : দেখ দেখ বিবেকানন্দ তাঁর চিরজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজো চিরজীবী।

—শ্রীঅরবিন্দ

(বিশ্ববিবেক—দিলীপকুমার রায়ের প্রবন্ধ হইতে)

তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবী করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম-বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, তুই বীর-রে! তিনি জানিতেন যে তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এক ভগবৎবাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে—'তুই বীর রে'।

—শ্রীঅরবিন্দ

(বিশ্ববিবেক—'মনীষীসঙ্গমে')

বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁহার গুরু বলিয়াছিলেন, তিনি জগৎকে দুই হাতে ধরিয়া বদলাইয়া দিবার মত শক্তিধর পুরুষ। সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সমক্ষে প্রথম প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিল, ভারত জাগিয়াছে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নহে, জয় করিবার জন্য সে জাগিয়াছে।

—শ্রীঅরবিন্দ

ইহা নিশ্চিত যে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী কাহারও নিকট হইতে কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাহাদের এমন একটি স্বকীয় আবেদন আছে যে তাহা অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না।

—মহাত্মা গান্ধী

আজ (১৯২৩) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে; তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিতে আমি এখানে (বেলুড়) উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার রচনাবলী গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছি। তাহার অধ্যয়নের ফলে স্বদেশের প্রতি আমার যে অনুরাগ ছিল তাহা সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়াছে। হে যুবসমাজ, যে স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করিতেন এবং যেখানে তাঁহার দেহাবসান হয়, যেখানে হইতে তাঁহার ভাবশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র অন্তরে গ্রহণ না করিয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইও না—তোমাদিগকে ইহাই আমার বলিবার কথা।

—মহাত্মা গান্ধী

স্বামীজী পৌরুষদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতীক। তীব্র সংগ্রাম-নিষ্ঠা ছিল তাঁর অণুপরমাণুতে। এর ফলে তিনি হয়েছিলেন শক্তির এক শ্রেষ্ঠ উপাসক। আর এই জন্যই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের এক ফলিত বা কর্মধৃত রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। প্রায়ই তাঁকে উল্লেখ করতে শোনা যেত— "বলং বলং—এই কথাই উপনিষদ বার বার বলেছেন।" স্বামিজীর মতে জীবনগঠনের মূল উপাদান চরিত্র— এই চরিত্রের উপর তিনি অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য, তাঁর মহত্ত্বের কথা বলে যেতে পারি, কিন্তু সে সব কথা হবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাতে এই বিরাট পুরুষের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়ে উঠবে না, তিনি ছিলেন এত মহৎ এত গভীর ও এত বহুমুখীন প্রতিভাসম্পন্ন। স্বামী বিবেকানন্দকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমি শুধু এক কথায় এই বলতে পারি—এক উচ্চতম অনুভূতিসম্পন্ন যোগী হয়েও, পরম সত্য উপলব্ধি করেও তিনি সাময়িকভাবে তাঁর মহান জীবনকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। আজ যদি তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন, আমার স্থান হত তাঁর পায়ের তলে। আধুনিক যুগের বাংলা স্বামী বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি এ কথা বললে হয়ত ভুল হবে না।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাঙ্গলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী ষড়রিপু জয় করিয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা

হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধবুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতিগঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন "Man-making is my mission—খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।"

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তা-সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনও দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারত বিজয় একটি দৈব ঘটনা বা Divine Dispensation। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। "Freedom, Freedom is the song of the soul," এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁর সাধনার ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া—এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বিবেকানন্দের জন্মদিনে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের দারিদ্র্য এখনও কমেনি এবং বাংলাদেশে তার আধিক্য যথেষ্টভাবে বিদ্যমান। ভারতে গরীবদের সেবা করা এখনও বাকি রয়েছে। জনসাধারণের সেবার্থে নিজ নিজ বাসনা ত্যাগ করে আমাদের পরিভ্রমণে বেরুতে হবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে হবে।

দরিদ্র-নারায়ণ শব্দটি স্বামী বিবেকানন্দের দান। তাই আমাদের কর্তব্য হবে দেশের 'দারিদ্র্য'কে মিটিয়ে ফেলে কেবল 'নারায়ণ'কে রাখা···আমরা তাই বলি যে, জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগের কথা তখনই বোঝান যাবে যখন তাদের ক্ষুধা মিটে যাবে। সুতরাং বাংলাদেশে যদি এখনও দরিদ্র থেকে যায় আর তার সেবা করা না হয়, তাহলে বিবেকানন্দের আত্মা শান্তি পাবে না।

—আচার্য বিনোবা ভাবে

স্বামী বিবেকানন্দ যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময় ভারতবর্ষ গোলামিতে পরিপূর্ণ ছিল। জড়শক্তির চাপে ও প্রভাবে আমরা তখন এত নীচে নেমে গিয়েছিলাম যে, আমরা নিজদিগকে হীন মনে করতাম। আমাদের সমাজশাস্ত্র বাজে, রাজনীতির কিছুই আমরা জানিনে, এমনকি আমাদের ধর্মও পূর্ণ নয়—এরূপ ভাবনায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সমাজে যে দোষ ছিল না, তা নয়। কিন্তু প্রত্যেক

দেশেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, শক্তি থাকে। ভারতেরও তেমন এক শক্তি রয়েছে। ভারত দশ হাজার বছর ধরে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করে আসছে। কিন্তু ইংরেজের অধীনে থাকার ফলে আমরা সেই শক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভারতের এইরূপ অবস্থায় স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন এবং সেখানে বেদান্তের কথা দুনিয়াকে শোনালেন, আধ্যাত্মিকতার যে বিরাট শক্তি ভারতের রয়েছে তা সবাইকে বললেন। সেখানে তাঁর সেই ভাষণ ভারতের উপর অমৃতবর্ষণের মত কাজ হল। ভারতবাসীদের মনে এই বিশ্বাস এল যে তাদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। এভাবে দেশের নিজস্ব শক্তির মর্যাদা বিবেকানন্দ ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন—এ এক অতি মহান কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

—আচার্য বিনোবা ভাবে

এ ঠিক কথা যে বিবেকানন্দ তত প্রাচীন হননি। কিন্তু তিনি আমাদের সামনে এক প্রতীক হয়ে আছেন।

—আচার্য বিনোবা ভাবে

আজ আমরা শুধু এতদ্দেশের ইতিহাসে নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই এক সঙ্কটময় সময়ে উপনীত হইয়াছি। বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের ধারণা আমরা এক অতল গহ্বরের কিনারায় অবস্থিত রহিয়াছি। মূল্যবোধের বিকৃতি, আদর্শের নিম্নগামিতা, ব্যাপকভাবে কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখতা এবং জনজীবনব্যাপী প্রবল স্নায়বিক দৌর্বল্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। লোকে এইগুলি লইয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং হতাশা, ব্যর্থতা ও অসহায়তায় ভাঙিয়া পড়ে। আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান শুধু এই বস্তুগুলিই। মানুষের শক্তির প্রতি এই প্রকারের আস্থাহীনতা মানবিক মর্যাদাবোধের বিরুদ্ধে মুক্ত বিদ্রোহ বলা চলে। ইহা সত্যই মনুষ্যপ্রকৃতির অবমাননা। জগতে যত কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যপ্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। আর যদি বিবেকানন্দ আমাদের প্রতি কোন আহ্বান জানাইয়া থাকেন, তাহা হইতেছে আমাদের আপন আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর আস্থা স্থাপন করা। মানুষের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ রহিয়াছে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তাহার আত্মিক শক্তি চূড়ান্ত, মানুষ অদ্বিতীয়। এ বিশ্বে অনিবার্য বলিয়া কিছু নাই, এবং যে বিষমতম বিপদ ও অক্ষমতার আমরা নিত্য সম্মুখীন, তাহা আমরাই বিদূরিত করিতে পারি। শুধু আমরা কোনক্রমেই আশা ত্যাগ করিব না। তিনি আমাদিগকে দুঃখভোগে ধৈর্য, দুর্ভাগ্যে আশা ও ভগ্নোদ্যমে সাহস প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন: বাহ্য আকৃতি দেখিয়া ভুলিও না। গভীর অভ্যন্তরে এক ঐশী ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, বিশ্বজগতের অন্তর্দেশে এক উদ্দেশ্য বিরাজ করিতেছে। তোমাদের উচিত সেই উদ্দেশ্যের সহিত সহযোগিতা করা এবং উহা সর্বাংশে সাধন করা। ত্যাগ, বীর্য, সেবা ও নিয়মনিষ্ঠা—এই নীতিগুলিই আমরা তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারি।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নেতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সমগ্র শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকেই তাঁহার শেষ উক্তি করিয়া গিয়াছেন—"এই বালকগুলির তত্ত্বাবধান করিও।" তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তবু ও নির্দেশ আসিল—এক দৈব নির্দেশ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার শাখাকেন্দ্র শুধু ভারতে নয়, বহির্দেশেও রহিয়াছে। অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষ ও সমাজসেবার দিক দিয়া এই মিশন যে অতি মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে তৎ-

সম্পর্কে আমি অবগত আছি। তাঁহার সুদূর প্রসারী দিব্য-দৃষ্টির ফলেই এই মিশন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে বৃহৎ মানবগোষ্ঠী তুচ্ছ স্থূল জড়বাদের পাশে আবদ্ধ আছে তাহাকে আধ্যাত্মিক সহায়তাদান এবং তাহার জীবযাত্রা সংরক্ষণের জন্য এই মিশন যে বহুবর্ষ ধরিয়া কার্য করিয়া চলিবে তাহাতে আমি একেবারেই নিঃসংশয়। অতএব ইহা একান্তভাবে আবশ্যক যে, এই মহামানব কি সংকল্পসাধনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে কি শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা সম্যক স্মরণ করিব। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কেবল মাত্র স্মরণ করার প্রশ্ন ইহা নয়, পরন্ত তিনি আমাদিগকে কি কর্মে ব্রতী দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিব, তাহা আমাদের গভীর সত্তায় একীভূত করিব এবং যে দেশ বিবেকানন্দকে জন্মদান করিয়াছে তাহার উপযুক্ত নাগরিক হইয়া উঠিব।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে স্বামীজী যে ভারতকে অবলোকন করিয়াছেন তাহা স্বাধীন ও শক্তিশালী ভারত। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে এবং এই নবার্জিত স্বাধীনতার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ও সর্বনাশকর বিপদাশঙ্কার প্রতিবিধান আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাক্য, মাত্র বাক্যের দ্বারা আমরা ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইব না। আমাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, কি পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা দৃঢ় নৈতিক চেতনার যন্ত্রটিকে সমাজ-সেবা ও রাজনৈতিক কর্মধারার লৌহ-বর্ত্মে পরিচালিত করিতে পারি। এই সকল বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন হইতে হইলে আমাদের নিজেদের গড়িয়া পিটিয়া উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে এবং দেশবাসীকেও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে।

ডক্টর জাকির হোসেন
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

যে সকল ব্যক্তি সমাজের আপন জনকে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই পরিচালিত করেন তাঁহারা সংখ্যায় স্বল্পমাত্র; আর যাঁহারা সেই নায়কদিগের উপর নায়কত্ব করেন সংখ্যায় তাঁহারা স্বল্পতর, সন্দেহ নাই। এই সকল অনন্যসাধারণ পথপ্রদর্শক নিমজ্জিতপ্রায় মানবসমাজের উদ্ধারকল্পে প্রায়শঃই আবির্ভূত হন না। এই প্রকার অলোকসামান্য মহাপুরুষগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। যিনি সমগ্র মানবসমাজকে সেবা করিতে, বহু দুর্ভাগ্য-পীড়িতকে পথ প্রদর্শন করিতে এবং বিশ্বে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া বৈদিক সভ্যতার গৌরবদীপ্তিতে আধ্যাত্মিক জগতের মহাকাশে সমুজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ করিতে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভারত সেই মহামানবের স্মৃতি বহন করিয়া বস্তুতঃই মহিমান্বিত বোধ করিতেছে। বিশ্বাসহীন প্রতীচ্য-মানসকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নিয়মিত করিতে একমাত্র তাঁহারই সাধ্য ছিল। প্রাচ্যে তাঁহার পূর্বেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারার্থ বহিঃপ্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় আর কেহই গভীর-আত্মপ্রত্যয়ের কণ্ঠে প্রতীচ্যকে আপন বাণী শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধ ও বিমোহিত করিতে পারেন নাই। সুযোগ্য গুরুর সুযোগ্য এই শিষ্য মানুষের বিভিন্ন জাতিগত জীবনের অন্তরালে অবস্থিত এক অন্তর্নিহিত ঐক্যের এবং সকল মানবাত্মার অন্তঃস্থলে বিরাজিত এক বিশ্বজনীন প্রেম ও পরমাত্মীয়তার বাণী

বিঘোষিত করিয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। বীজ ও মহীরুহের সম্পর্ক-সদৃশ আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষের দুই অবিচ্ছিন্ন ধারার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ উভয়ে উভয়ের সত্তাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ
ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি

ইতোমধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে; সেইজন্য বোধ করি বিঘ্ন-সঙ্কুল সেই সকল পুরাতন দিনে আমাদের পূর্বতন যে পথিকৃৎগণ ভারতকে নবরূপ দান করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগকে ভুলিতে বসিয়াছি। আপনারা যদি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী পাঠ করেন তাহা হইলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য বোধ করিবেন যে সেগুলি প্রাচীন হয় নাই। এগুলি ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বে উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু আজিও তাহারা অম্লান রহিয়াছে; তাহার কারণ তিনি যাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বা যে বিষয়েই উক্তি করিয়াছেন সেগুলি আমাদের দেশের তথা বিশ্বসমস্যার কতকগুলি মূলতত্ত্ব বা লক্ষণ-সম্পর্কিত। সেইজন্যই তাহারা প্রাচীন হয় না। এখনও যদি আপনারা সেগুলি পাঠ করেন তাহারা পূর্ববৎ প্রাণবান বোধ হইবে। তিনি আমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহা আমাদের উত্তরাধিকারে একপ্রকার গর্ববোধ—শব্দটি যদি আমাকে যথাযথ প্রয়োগ করিতে হয়—আনিয়া দিয়াছে। তিনি আমাদিগকে অব্যাহতি দেন নাই। তিনি আমাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও উক্তি করিয়াছেন। তিনি কিছুই গোপন রাখিতে চাহেন নাই। সত্য বলিতে কি, তাহা উচিতও হইত না। কারণ, আমাদিগকে ঐ ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে হইবে। তিনিও ঐ ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে কঠিনভাবে আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু আবার সময়ে সময়ে তিনি ভারতবর্ষ যে মহৎ কার্যাবলীর জন্য খ্যাত এবং যেগুলি তাহার অধঃপতনের যুগেও কতকাংশে তাহার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা অঙ্গুলি-নির্দেশে আমাদের লক্ষীভূত করিয়াছেন।

সুতরাং স্বামীজী যাহাই লিখিয়াছেন অথবা বলিয়াছেন সেগুলি সবই চিত্তাকর্ষক; সেগুলি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করিবেই এবং বোধ করি আগামী দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদিগকে প্রভাবিত করিতে থাকিবে। সাধারণ অর্থে তিনি রাজনীতিক ছিলেন না; কিন্তু তবুও আমার চিন্তায় তিনি ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের মহান পুরোধাগণের—ইচ্ছা করিলে অবশ্য আপনারা অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন—অন্যতম ছিলেন। সত্যই পরবর্তীকালে যে বহুসংখ্যক স্বদেশবাসী এই আন্দোলনে অল্পবিস্তর সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে নবোন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, তিনি অদ্যকার ভারতবর্ষের উপর বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন; এবং আমার বিশ্বাস তরুণ বংশধরগণ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে স্বতঃপ্রবাহিত এই আগ্নেয় তেজ, এই আত্মিক শক্তি ও এই পরিণত জ্ঞানের উৎসধারার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।…

অবশিষ্ট সমগ্র জগতের মত ভারতবর্ষকেও এই সকল কঠিন সমস্যা এবং প্রশ্নের (নৈতিক দীনতা ইত্যাদি) সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এবং ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত অথবা জাতিগতভাবেই হউক, আমরা অতি কঠিন পরীক্ষাসমূহে পতিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি স্থির জানি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র যে এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহা নহে, ভারত সবল হইয়া উঠিবে।

কারণ, আমার বিশ্বাস, আমাদের সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে মূলতঃ এমন একটি জীবনীশক্তি সঞ্চিত আছে যাহার ফলে ভারত বহুবর্ষ ধরিয়া স্বর্গীয় সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ সৌম্য দিনগুলি যাপন করিতে পারিয়াছে—এবং তাহাই বর্তমানে উপযুক্ত সুযোগলাভের পর অধিকতর সার্থকভাবে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে কার্য করিয়া চলিবে। আমার যথার্থ এইরূপ বিশ্বাসই আছে ; কিন্তু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। ইহার জন্য আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আর এতদুদ্দেশ্যে কেবল কর্ম করিলেই চলিবে না, পরন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া কর্ম করিতে হইবে। ঐ অনাগত ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমরা ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারি। বিশ্বের পক্ষে ইহাপেক্ষা বৃহত্তর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করা একান্তভাবে আবশ্যক। ইহা কোন সংকীর্ণ দৃষ্টির কথা নয়। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদ কোন ক্রমেই কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ একান্তভাবে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইলেও তিনি পূর্বোক্ত আদর্শ ব্যতীত অন্য কিছু প্রচার করেন নাই। তাঁহার দেশাত্মবোধ এবম্প্রকার ছিল যে, নিতান্ত সহজভাবেই তাহা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতারই অঙ্গমাত্র। সুতরাং এই সকল মহামানবের নিকট হইতে আমরা এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী যথাশক্তি কর্তব্যপালনে ব্রতী হইবে। তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদের স্মৃতিকে সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব এবং আমাদের মাতৃভূমিকে সেবা করিতেও কিছু সুযোগলাভ করিব ; তৎসঙ্গে বোধ করি সমগ্র মনুষ্যসমাজকেও সেবা করিতে পারিব।

জওহরলাল নেহরু
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ১৯৪৯ সালে প্রদত্ত ভাষণ হইতে।

LIBRARY
No.............
Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

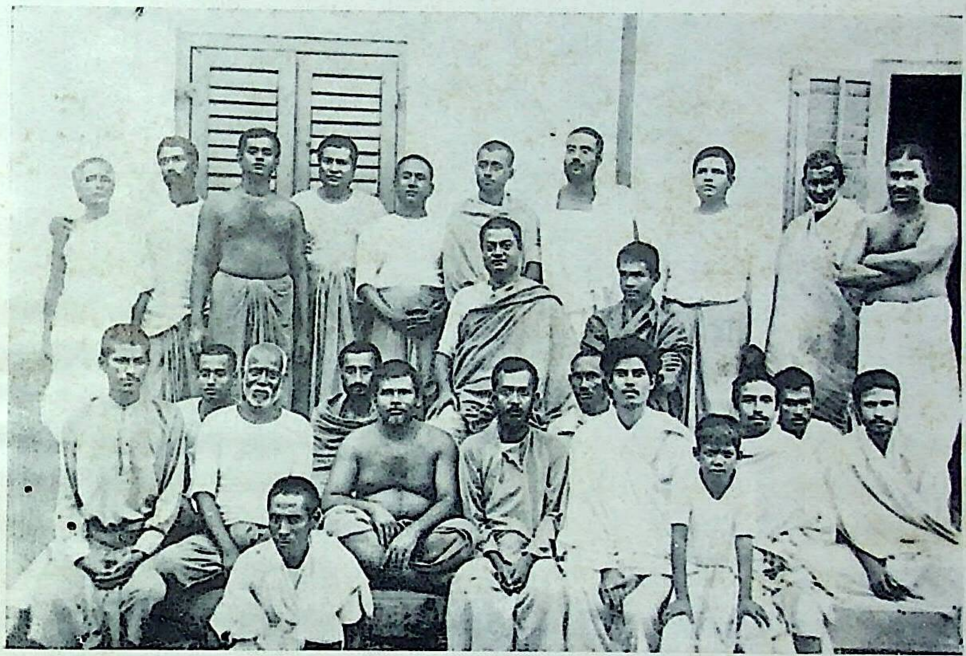

বেলুড় মঠ— ১৯শে জুন, ১৮৯৯
(দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রার পূর্ব দিন)

"বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

কাশ্মীর — ১৮৯৮

বাম হইতে : মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লাউড (জয়া), মিসেস্ ওলি বুল (ধীরামাতা), স্বামীজী, ভগিনী নিবেদিতা

"বিবেকানন্দ যদি সর্ববিধ বন্ধনের অপনোদক না হন, তবে তিনি আর কি হইলেন!"

—জনৈক পাশ্চাত্য ভক্ত

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

বহ্নি-বাণী

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না।…অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।—অনুকরণ হীন, কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার বিনাশ আসন্ন।—তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময়, পূর্বপুরুষগণের বংশধর,—তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর, আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর।…

*

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলেও অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র জাতের চিন্তারাশিতে ভারতের দান তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

*

আমি চাই—A band of Young Bengal (একদল জোয়ান বাঙালীর ছেলে), এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা, আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) ক'রে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ সাধন করতে জীবন-পাত করতে পারবে, নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমঃপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অ-পটু—মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

*

আমাদিগকে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত প্রত্যেক জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহার জন্য আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো, বলিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী" যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবেন। এই-ই সময় তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি স্থির করিবার—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে: কাজে লাগো—এই-ই সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণযোগ্য, তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ করিবার ও ওকালতি প্রভৃতি কার্যের অপেক্ষা বড় বড় কার্য করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প—সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম। এই জীবনে আর আছে কি?…জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু

আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত। অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস, একটা মহান আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি।

*

অহঙ্কৃত হইও না। গোঁড়াদের মত জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও কিছু বলিও না।...বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতেই উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত; অনন্ত; সর্বগ্রাসী; সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক।

*

আমাদের কার্য,—কাজ করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান মহৎ মহৎ কার্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করিবেন।...ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে; সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি।

*

নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। নেতৃত্ব-কার্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থ হও; আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিও না, অনন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাক; সিদ্ধি তোমার করতলে।...কাজ কর, কাজ কর, পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ।...যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে।...গুপ্ত বদমায়েসি, লুকানো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে, হে বীর হৃদয় বালকগণ, কার্যে অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

*

পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করবো; এতে যে বাধা-বিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। মা বাবা, ভাইবন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক্ যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইবো না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা করে, একমনে আপনার Goal-এর (উদ্দেশ্যের) দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই পুরুষকার। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। সংসারের সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ। কিছুতেই

ভ্রূক্ষেপ করবিনি। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা, তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ অভয়বাণী শুনা—

"তত্ত্বমসি",

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

*

হামবড়া বা দাপাদাপি, বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে। এইটি যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

*

টাকায় কিছু হয় না, নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।

*

চালাকীদ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

*

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনও শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কাজ হইতে পারে না।…অহংভাব ও ঈর্ষা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ।

*

সকলের দোষ সহ্য করিবে, অপরাধ লক্ষ লক্ষ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এইজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।

*

যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষা-পরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীন কালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষা দ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে-সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে।

*

শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? 'It is better to wear out than to rust out.' (মর্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে তার, ভাবনা কি?

*

চিরদিন তেজস্বী হও, বীরদিগেরই মুক্তি করতলগত,—কাপুরুষদিগের নহে।...হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার খসাইতে ও অজ্ঞজনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

*

ধৈর্য ধরিয়া থাক, বৎস, অভাবনীয়রূপে কার্যের উন্নতি হইবে। সকল কার্যেই কৃতকার্য হইবার পূর্বে শত শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে, তারা শীঘ্র বা বিলম্বে আলো দেখিতে পাইবে।

*

আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কার্য বন্ধ কর্‌লে সহরে হাহাকার রব উঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখ-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্‌ছি—'ছুঁসনে', 'ছুঁসনে'। দেশে কি আর দয়া-ধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্' ব'লে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। সর্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চার না হ'লে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দেখিছিস্? ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্‌বি!

*

আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-মীশ্বর কিছুই আর নাই। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

*

তোরা ভাবছিস্ আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভিতর পুরে, পাশ করে ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার উঠেছে। তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী-গুখুরী করে' নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্য-নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। ঐ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে

রজোগুণতৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্ন-বস্ত্রাভাবে, চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস্? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-মাস্ত্র গঙ্গাজলে।

*

আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর। আর স্মরণ রাখিও আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে।

*

······তোদের ভিতর অখণ্ড শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ্ ওঠ্ লেগে পড়্, কোমর বাঁধ্। কি হবে দু-দিনের ধনমান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস,—আমি মুক্তি-যুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভিতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী কর্‌তে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতে প্রস্তুত।······মর্‌তে হয় একেবারেই মর্‌বি। কাপুরুষের মতো অহরহ মৃত্যুচিন্তা করে' বারবার মর্‌বি কেন?···মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন···ফস্ করে মরাটা ভাল নয় কি?

*

আমাদের কার্য্য হচ্ছে নিজেদের জীবনে ভাল কাজ ক'রে লোকের সামনে Example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) ক'রে কোন কার্য্য সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়, যে যা বলে বলুক, বলুক, কাকেও contradict (বিরুদ্ধ তর্ক করে' পরাস্ত করার চেষ্টা) কর্‌বিনি। এই মায়ার জগতে যা কর্‌তে যাবি তাতেই দোষ থাক্‌বে—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা"—আগুন থাক্‌লেই ধূম উঠ্‌বে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে' থাক্‌তে হবে? যতটা পারিস্ ভাল কার্য করে' যেতে হবে।

*

উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মানব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্ব্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে; কিন্তু অধিকতর দুর্ব্বলতা দ্বারা কি এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ"—'ভয়শূন্য' এই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ',—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।···

*

এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্ব্ব-সাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে, সবল-দুর্ব্বল উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে, সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। উঠ, জাগো—যতদিন না চরমলক্ষ্যে পহুঁছিতেছ, ততদিন

নিশ্চিন্ত থাকিও না।···ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে—শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু ভাল সকলেই আসিবে।

*

আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না ; কারণ, নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি একবার কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নিবীর্য্য হইয়া যায়। মৃত্যু-কীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে।···নির্ভীক সাহসী লোক ইহাই আমরা চাই। আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক।

*

আমরা এখন বৈদান্তিক নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল ছুঁৎমার্গী ; আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘর! আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি, আর মন্ত্র—'আমায় ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, আমি মহা পবিত্র'! যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে! প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্য্যের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে ধনভাণ্ডার আমরা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি,—তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে।

*

History repeats itself (ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে—মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাত কখনই বড় হতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি-মূর্ত্তির অবমাননা করা।

*

···ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই ; দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্ব-জাতি-বিদ্বেষ, আছে দুর্ব্বলের যেনতেন-প্রকারেণ সর্বনাশ সাধনের প্রকাণ্ড ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থ-সাধনে, জ্ঞান অনিত্য-বস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে, এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা।

*

জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে,

ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

*

এ সনাতন ধর্ম্মের দেশ। এ দেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠ্‌বে। এমন উঠ্‌বে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিস্‌নি? নদী বা সমুদ্রের তরঙ্গ যত নামে, ঢেউটা তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও সেইরূপ হবে। দেখিস্ না পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য ওঠবার আর বিলম্ব নাই।

*

বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সাম্‌নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্য-পরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী, তোমাদের প্রণাম করি।

*

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল আমূল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা—আমার সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।...আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ।...দোষ সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মতন। পা হইতে বাত দূর করিলে, মাথায় বাত ধরিল, মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহা অন্যত্র আশ্রয় লইল।...অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃষ্ট উপায়।

*

নিজের ভাবনা যখনই ভাববে তখনি অশান্তি।...আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।—শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং, পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎসৃজেৎ। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়; দোস্‌রা আর উপায় নাই—একেবারেই নাই। তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব কাজে লেগে যা।

—————

স্বামীজী প্রসঙ্গে গুরুভ্রাতাগণ

স্বামীজীর সবই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই চৈতন্যময় পুরুষের কাছে সবসময় ঘেঁষা যেত না। আবার এক একসময় কত নিকটের মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রেমের খেই আমরা পেতাম না।…তাঁর ছিল প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ, আমরা তাঁরই বাঁধা গৎ বাজাচ্ছি, তাও ঠিক হচ্চে না।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

*   *   *

স্বামীজী হলেন আমাদের মাথার মণি। তাঁর জন্য আমরা নিজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিনে। বুকের রক্ত দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে নিজেদের ধন্য মনে করব।

—স্বামী শিবানন্দ

*   *   *

তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী, ঐশ্বর্যে ও দারিদ্র্যে তিনি সমান থাকতেন। তিনি জানতেন, তিনি সাক্ষিস্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা। সুখ বা দুঃখ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। দুনিয়াটি ছিল তাঁর কাছে একটি রঙ্গমঞ্চ। কি সুন্দর ভাবেই না তিনি এ রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় করে গেলেন! পরার্থেই ছিল তাঁর জীবন-ধারণ। তাঁতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর নিজের কোন মতলব বা স্বার্থ ছিল না। ঠাকুরের বাণী ও সাধন-প্রচারই ছিল তাঁর জীবন-ব্রত। আমাদের ঠাকুর বলতেন, "সে যথেচ্ছ চলতে পারে। তাতে তার কোন দোষ হবে না।"

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

*   *   *

স্বামীজীর ঠাকুরকে ধ্যানে দেখে তৃপ্তি হত না। সাদা চোখে অন্য বস্তুর মত দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। সর্বদা মনে হত কেউ তাঁর হাত ধরে রয়েছে। অসুখের সময় ঐ হাত তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিত। তিনি অসুস্থ অবস্থায় কাকেও গায়ে হাত দিতে দিতেন না। অবশ্য এ কথা সেবককে জানতে দেননি। দেহ-রক্ষার কয়েক মাস পূর্বে বলেছিলেন, "এখন আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। আগেকার মত কেউ আমার হাত ধরে নেই।"…

—স্বামী সারদানন্দ

*   *   *

অনন্ত মত, অনন্ত পথ!—হামরা তাঁর কি জানি? কি বুঝি? বিবেকানন্দ ভাই বুঝেছে তাই ত হামাদের বোঝাচ্ছে। আরে তাঁর ভাব জগতকে বোঝাবার জন্যই ত তিনি বিবেকানন্দ ভাইকে রেখে গেছেন। তাই ত তিনি বলে গেছেন—"ওকে আমার কাজের জন্য টেনে এনেছি।" এসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল তাঁর সেই কথা—"ওরে! আর সবাইকে দেখি—কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড় জোর কেউ একটা বড় তারা। বাকী লোরেন আমার সূর্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হয়ে যায়।"

—স্বামী অদ্ভুতানন্দ

বীর বিবেকানন্দের আদেশ—"হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হবেই হবে"—সাক্ষাৎ শিববাক্য,—বিশ্বাস কর। যুবকগণ, সাবধান!…

এ যুগের ভগবান বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"—এ ভাব প্রত্যক্ষ কর, মানব জীবন ধন্য কর, স্বামীজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর।

—স্বামী প্রেমানন্দ

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতে, ইংলণ্ডে ও এই দেশে থাকবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমার এই গুরুভাইয়ের সঙ্গে থেকেছি ও ঘুরেছি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁর চরিত্র আমি লক্ষ্য করেছি; তবে আমার এ নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, এই তিন মহাদেশের কোথাও তাঁর মত আর একজন লোক মিলবে না, কেউ-ই এই অলোকসামান্য ব্যক্তিটির শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না।

—স্বামী অভেদানন্দ

* * *

এ যুগে ঠাকুর-স্বামীজীই প্রত্যক্ষ দেবতা। স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তত। ঠাকুরের দেখা পাওয়া অত সহজ নয়। এ যুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে।

—স্বামী অখণ্ডানন্দ

* * *

স্বামীজী বাইরে এত জ্ঞান কর্ম প্রচার করেছেন; কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল প্রেমের ভাব। ভিতরটা খুবই কোমল ছিল। বাইরে পৌরুষ বিক্রম কিন্তু তাঁর প্রাণ ছিল মায়ের প্রাণের মত কোমল, আর গুরুভাইদের প্রতি তাঁর কি গভীর ভালবাসাই না ছিল।

স্বামীজীর বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব দেখেছি। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আর একজন লোক হয়ে যেতেন। তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তা লোকের অন্তরস্পর্শী হত। তাঁর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। লোকে তাঁর কাছে যেন কেঁচো হয়ে যেত। বেলুড় মঠে স্বচক্ষে দেখেছি—তিনি চেয়ারে বসে আছেন আর তাঁর বিশিষ্ট বিশিষ্ট পাশ্চাত্য শিষ্যরা চারিদিকে ঘিরে মাটির উপর আসনপিঁড়ি হয়ে হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন, তাঁর শ্রীমুখের কথা শোনবার জন্য। তাঁর কথার কি জোর! এখন তাঁর কথামত কাজ হয়ে যাচ্ছে; লোকে তাঁর বাণী থেকে শক্তি পাচ্ছে।

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বিবেক-স্মৃতি

স্বামী ওঙ্কারানন্দ

বর্তমান যুগকে নানা আখ্যায় মণ্ডিত করা হয়—সংস্কার যুগ, বৈজ্ঞানিক যুগ, মানবতা যুগ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে মানবতার ভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু আসল মানবতার প্রকাশ উক্ত বিষয়ে পাওয়া যায় না; আত্মিক দৃষ্টিতে মানবতার পূর্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মিক দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহা জড়রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত, তাহা চৈতন্যময় দেখা যায়। ভেদের লেশমাত্র থাকে না। সে অবস্থা যদি কোন প্রকারে প্রকাশ করার দরকার হয় তাহা হইলে তাহাকে অভেদরূপ বলা হয়। এই অবস্থাতে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। এখানেই প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি। এখানেই প্রেমিক সকলকে সমানভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে—ইহাই প্রকৃত মানবতা। ইহারই প্রকাশ স্বামীজীর অনুভূতিতে দেখা যায়—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। এইজন্যই তিনি নরকে নারায়ণরূপে সেবা করিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে ও কোন কোন মনীষীর উক্তিতে এইভাবে অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যাইলেও এই জলন্ত বৈদান্তিক প্রেমিকের মত, ব্যবহারক্ষেত্রের প্রতি খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে এত বেদনা, এত দরদ ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সমস্ত সমস্যা ও তাহার মীমাংসা অন্য কোন মতবাদীর আচরণে দেখা যায় না। এ যেন আকাশের মত নির্লিপ্ত ও বিরাট দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যষ্টির ছন্দে, তাহার সুরে, তাহার তালে সম্পূর্ণরূপে তদাত্ম হইয়া সেই ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া ব্যষ্টিতে সম্পূর্ণ না থাকিয়া—সমষ্টি বা বিরাটের দৃষ্টিতে সমস্ত সীমার অতীত তত্ত্বে ব্যষ্টিকে দেখা—এক কথায় নিত্যে থাকিয়াও লীলাময়ের লীলাতে তদ্গত হইয়া লীলায় খেলা। এরূপ না হইলে প্রকৃত মানবতা হয় না—বিশ্বের সঙ্গে এক না হইলে—শুধু কল্পনায় নয়, বাস্তবরূপে না হইলে মানবতা আসে না। অন্যান্য মানবতার মতবাদে কেবল ভাবের পরিবর্তে বাক্‌ছটামাত্রের প্রকাশ। এইখানেই ঠিক ঠিক জীবের স্বাধীনতা ও এখানেই জীবের ঠিক ঠিক মর্যাদা ও সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়।

প্রবন্ধে, পুস্তকে, বক্তৃতায় গণ-স্বাধীনতা ও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য জানিবার কথা নানাভাবে শোনা যায়; লেখক, বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ জীবনের কর্মক্ষেত্রে এই বিষয়ে কতটা আচরণ করিয়াছেন বা করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বা আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ সেই সেই ব্যক্তিগণের জীবনের ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। রুশোর মত লোক যিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের একজন বিশিষ্ট পূজারী—রুশ সম্রাটের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা—কেমন করিয়া তাহা স্বীকার ও কেবলমাত্র গ্রহণ নয়—নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ ও সমর্থন করিলেন, এইটাই আশ্চর্য। জীবন ও আচরণে কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে কিন্তু ইহার বিপরীত—তিনি বাল্যাবধি চিন্তা ও আচরণে স্বাধীনতা উদারতা প্রাণের সহিত জানিতেন এবং জীবনে ও আচরণে পালন করিতেন। এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় থাকাকালীন একটি বক্তৃতায় বলিতে বলিতে এমন inspired (ভাবোন্মত্ত) হইয়া যান যে শ্রোতারাও তাঁহার কথায় মাতিয়া উঠেন—মনে হইল, যেন তাঁহারা সেই সময়ের জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেছেন। এমন সময় স্বামীজী হঠাৎ বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্তম্ভিত। স্বামীজীর সহিত একটি ভক্তের কন্যা সভায় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল—"স্বামীজী, এমন সুন্দর তুমি বক্তৃতা দিচ্ছিলে—লোকে আগ্রহ করে শুনছিল, তুমি হঠাৎ বক্তৃতা বন্ধ করলে কেন? তুমি কি বক্তৃতার

point-টা ভুলে গিয়েছিলে?" স্বামীজী বলিলেন—"না। আমি দেখলুম—লোকগুলো আমার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্চে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব হারাচ্চে। সেইজন্য বক্তৃতা বন্ধ করলুম।" ধন্য তোমার ব্যক্তিত্বে নিষ্ঠা—ধন্য তোমার উদারতা ও সমতা! কয়জন ব্যক্তি এইসময় লোকসাম্য ও নিজের প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে!

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা হইল। সকলে আনন্দিত যে, জগদ্ধিতায় কার্য এইবার ভালভাবে প্রসারিত হইবে। আর স্বামীজীও একটু বিশ্রাম লাভ করিবেন। কিন্তু 'উল্টা সমঝালি রাম'। গুরুভাইয়েরা ও শিষ্যেরা তাঁহার সেবা ও তাঁহার কথামত কার্যে রত। কিন্তু এমন সময়ে সেই বিরাট মনে এক তরঙ্গ উঠিল। "বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাঁচে না—অতএব আমায় সরে যেতে হবে! নইলে এদের (গুরুভাই ও শিষ্যদের) ঠিক ঠিক growth হবে না।" সঙ্কল্পেও যা, কাজেও তাই। অল্পদিন পরে মহাসমাধি। এ যেন ব্যক্তিত্বের মর্যাদা রক্ষাকল্পে আকাশের মত নির্লিপ্ত হয়ে নিজ ব্যক্তিত্বের লোপ।

জিজ্ঞাসা ওঠে—কেন এতটা? ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীক, কারুর ভাব নষ্ট করতে নেই—এই অমূল্য উপদেশের মূর্ত বিগ্রহ, তিনি কি করিয়া ভাবের বিপরীত অনুষ্ঠান করিবেন? কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন শিবরাত্রির শেষ পূজায় তাঁহার অমোঘবাণী মনে যে চির-জাগ্রত: "কি করলি বল দেখি, তোর ভাব, ছেলেটার মধ্যে ঢুকালি? যাক্, ছেলেটার ভাগ্য ভাল। মা তোকে দেখিয়ে দেবেন—কোথায় কি ভাবে শক্তি সঞ্চার করতে হবে।" সেই মায়ের ক্রীড়াপুত্তলী বিবেকানন্দ কি করে লীলাময়ীর লীলার ছন্দের ব্যতিক্রম করিবেন?

প্রকাশানন্দ স্বামী তখন মায়াবতীর কার্যে নিযুক্ত। ওই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ। প্রকাশানন্দ স্বামী তপস্যা করিবার জন্য স্বামীজীর নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছেন ও মায়াবতীর কার্য হইতে বিশ্রাম লইবেন এইরূপ অভিপ্রায় স্বরূপানন্দকে জানাইয়াছেন। স্বরূপানন্দ স্বামী তাঁহাকে রাখিবার জন্য কাজের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া যাহাতে প্রকাশানন্দের তপস্যায় না যাওয়া হয় ও মায়াবতীতে থাকেন সেই বিষয়ে স্বামীজীকে পত্র দিয়াছেন। ওই পত্র পাইয়াই স্বামীজী বলেন—"আমি কাহারও independence-এর উপর হাত দিতে পারি না।" এই না হইলে তুমি কি ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার ঋষি হইতে পারিতে? এই না হইলে বলিতাম—তুমি বিধির দাস। নিয়মের দাস।

বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক সভা বেশ জমকালো ভাবে ভক্ত হরিপদবাবু ও কিরণবাবু নিজ বাটীতে আয়োজন করিয়াছেন। সেখানে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ উপস্থিত। সকলে ধরিয়া বসিলেন প্রেমানন্দ স্বামীকে—আপনি কিছু বলুন। তারপর প্রেমানন্দজী তদ্গত হইয়া বলিলেন—"তোমরা মনে করচো, এই বিবেকানন্দ সোসাইটি করে স্বামীজীকে প্রচার করবে। তিনি আকাশের মত উদার। —ইট কাঠ মাটি চুনে কি তার প্রচার হবে? মানুষের হৃদয়ে তাঁর মন্দির করতে হবে। তাহলেই ঠিক ঠিক প্রচার হবে।" সত্যই প্রাণের দেবতার আসন হৃদয়ে, অন্য জায়গায় নয়—তাহা না হইলে তাহার মর্যাদা থাকে না। মঠ, মন্দির, আড়ম্বর, ক্রিয়ার বাহুল্য—যেখানে প্রাণের কোন স্পর্শ নাই—সেখানে মানবতার বিগ্রহের কোন স্থান নাই।

হে বীরেশ, হে মূর্ত অভীঃ, হে প্রেমিক, হে মানবতার মূর্ত বিগ্রহ—এই স্বাধীনতার দিনে তোমার আগ্নেয়গিরি স্ফুরণের মত ওজস্বিনী বাণী, স্নিগ্ধলোচনে করুণাপূর্ণ দৃষ্টি, সব দুর্বলতা—তম-নিরাকরণকারী ভঙ্গিমা, যেন আমাদের সত্তাকে নবীনভাবে সঞ্জীবিত করিয়া—"মা, আমায় মানুষ কর"—এই অমৃতময় বাণীর সার্থকতা জীবনে আনয়ন করে।

গীতি-অর্ঘ্য

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী গর্গানন্দ

ইমন ভূপালি—একতাল

ভুবনমোহন কে এ—
দীর্ঘলোচন দীপ্তললাট জ্ঞানজ্যোতি ঝলকে ঝলকে।
অসীম প্রতিভা অশেষ শকতি,
অপার শ্রদ্ধা অতুল ভকতি,
কর্মসিন্ধু-মন্থনে সদা নন্দিত হৃদি পুলকে পুলকে।
সিদ্ধধ্যানা সিদ্ধযোগী, আত্মমগন বিষয়-বিরাগী,
হুংকারে 'অভীঃ'-মন্ত্র গরজে, নব নব রূপ পলকে পলকে॥

[বাদী—গ, সংবাদী—ধ ; সময়—রাত্রি ১ম প্রহর]

০   ১   +   ৩

II { সপা পা পা । সা সা রা । পা -া গা । রগা রা সা } II
ভু ব ন মো হ ন কে ০ ০ এ ০ ০

II গা -া পা । পা পা পা । পধা না ধা । পা হ্মা গা I
দী ০ র্ঘ লো চ ন দী ০ প্ত ল লা ট

I পা -া ধা । -া ধা ধা । হ্মা ধা না । ধপা হ্মগা গা II
জ্ঞা ০ ন ০ জ্যো তি ঝ ল কে ঝ ল কে

II পা গা গা । পা ধপা ধা । র্সা -া ধা । র্রা র্সা র্সা I
অসী ০ ম প্র তি০ ভা অশে ০ ষ শ ক তি

I র্সা র্রা র্গা । র্রর্সা না ধা । ধা না ধা । পা হ্মগা গা I
অপা ০ র শ্র০ ০ দ্ধা অতু ০ ল ভ ক তি

I গা -া পা । পা -া পা । হ্মপা ধনা ধা । পা হ্মগা গা I
ক ০ র্ম সি ০ ন্ধু ম০ ০ ন্থ নে স দা

I গা ক্ষপা পা । ধা ধা ধা । ক্ষা ধা ক্ষনা । ধা ক্ষপা গা II
ন ০ ন্দি ত হৃ দি পু ল কে পু ল কে

II সা -া ধ্া । -া প্া প্া । ধ্া -া সা । সা সা সা I
সি ০ দ্ধ ০ ধ্যা নী সি ০ দ্ধ ০ যো গী

I গা -া গা । গা পা পা । রা গা রা । সধা সা সা I
আ ০ ত্ম ম গ ন বি ষ য় বি রা গী

I পা র্সা র্সা । ধা না পা । মা পা ধা । পা গা গা I
হু ং কা রে অ ভীঃ ম ০ ন্ত্র গ র জে

I রা গা পা । ধা ধা ধা । ক্ষা ধা না । ধা পক্ষা গা II
ন ব ন ব রূ প প ল কে প ল কে

দুর্গা—তেওরা

কে এ বালক দিব্য মুরতি নিজ মহিমায় রাজে
কমললোচন প্রসন্নবদন ধরা অঙ্গন মাঝে।
মহা চঞ্চল মহা ধ্যানময় এ কি নব রূপ লীলা-অভিনয়
যোগী-লক্ষণ সর্ব অঙ্গে তেজ-লাবণ্য-সাজে ॥

\+ ২ ৩ + ২ ৩
I সধা -া পা । মা পা । ধর্সা ধা । রা মা পা । রা সধ্া । সা সা I
কে ০ এ বা ০ ল ক দি ০ ব্য মু ০ র তি

I রা রা সা । রা মা । মা মা । পা -া -া । রা মা । রমা পধা I
নি জ ম হি ০ মা য় রা ০ ০ ০ ০ জে ০ ০

I সা সা সা । ধ্া -া । পা পা । ধ্া সা সা । রা -া । রা রা I
ক ম ল লো ০ চ ন প্র স ন্ন ব ০ দ ন

I মা -া মা । পা -া । ধপা পা । রা পা মা । রমা রসা । সধ্া সা I
ধ ॰ রা অ ॰ ঙ্গ ন মা ॰ ॰ ॰ ॰ ঝো ॰

I ধা -া পমা । পধা ধা । মা ধা । ধর্সা র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা র্সা I
ম ॰ হা চ ॰ ঞ্চ ল ম হা ধ্যা ন ॰ ম য়

I র্রা র্রা র্রা । র্মা -া । র্রা র্সা । মা মা পা । মপা মধা । ধা ধা I
এ কি ন ব ॰ রূ প লী লা অ ভি ॰ ন য়

I মা ধা ধা । মা পা । র্সা ধা । পমা মা রা । সা ধ্া । সা -া I
যো ॰ গী ল ॰ ক্ষ ণ স ॰ র্ব অ ॰ ঙ্গে ॰

I রা রা রা । মা -া । পা -া । ধা -া -া । মা পা । মপা মধা I
তে জ লা ব ॰ ণ্য ॰ সা ॰ ॰ ॰ ॰ জে ॰

RIDGELY MANOR.

Peace

Behold, it comes in might
the power that is not power
the light that is in darkness
the shade in dazzling light.

It is joy that never spoke
and grief unfelt profound
immortal life un-lived
Eternal death un-mourned
It is not joy nor sorrow
But that which is between
It is not night nor morrow
But that which joins them in.
It is sweet rest in music
and pause in sacred art.
The silence between speaking
Between the fits of passion
It is the calm of heart

স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত একটি কবিতার প্রতিলিপি

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

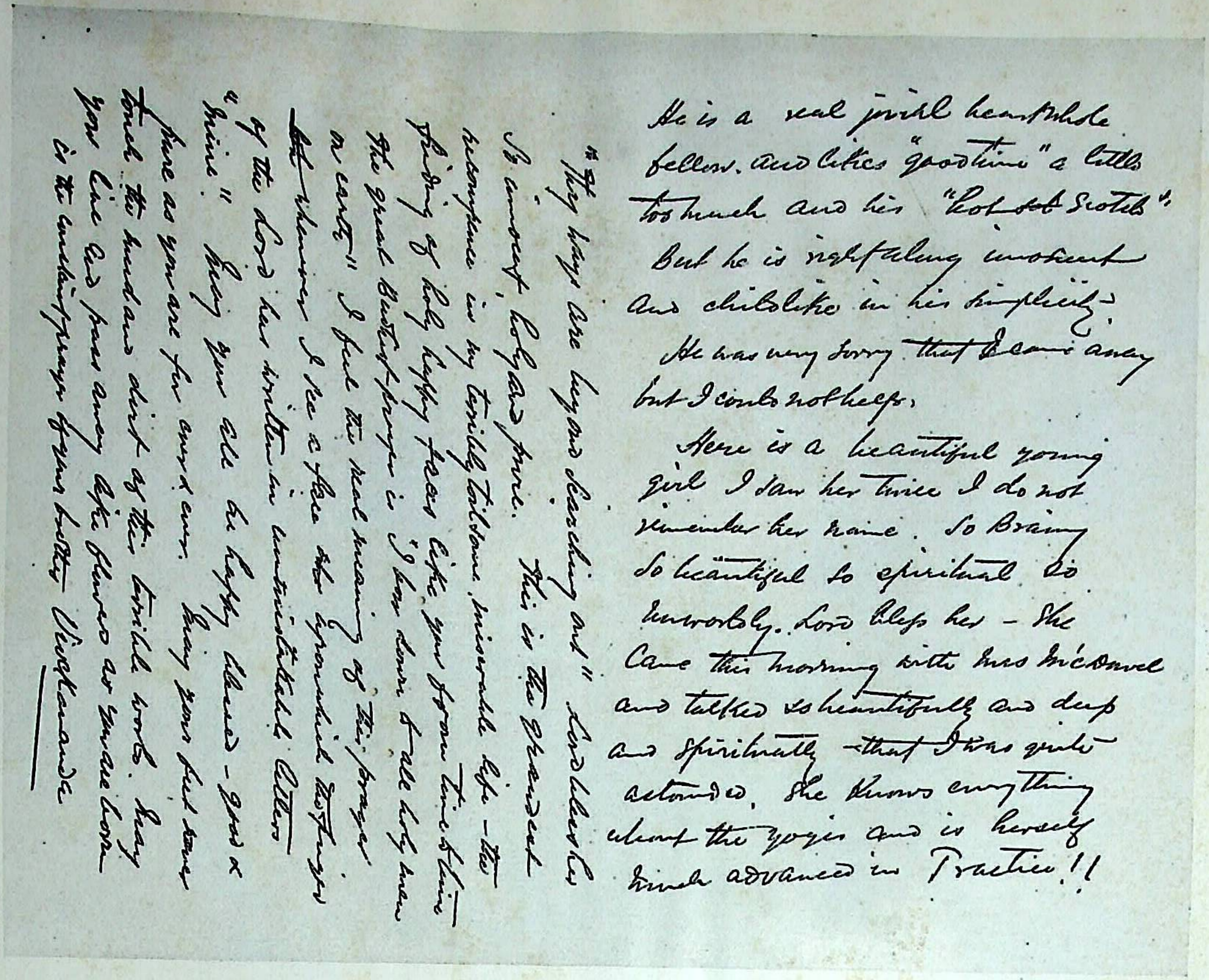

He is a real jovial heartwhole fellow. and likes "goodtime" a little too much and his "hot Scotch". But he is nightfalling innocent and childlike in his simplicity.

He was very sorry that I came away but I could not help.

Here is a beautiful young girl I saw her twice I do not remember her name. So Brainy so beautiful so spiritual so unworldly. Lord bless her — She came this morning with Mrs McDowel and talked so beautifully and deep and spiritually — that I was quite astounded. She knows everything about the yogis and is herself much advanced in Practice!!

"Thy ways are beyond searching out" Lord bless her so innocent, holy and pure. This is the grandest recompense in my terribly toilsome miserable life — the finding of holy happy faces like you from time to time. The great Buddhist prayer is "I bow down to all holy men on earth" I feel the real meaning of this prayer whenever I see a face upon which the finger of the Lord has written in unmistakable letters "mine". May you all be happy blessed — good & pure as you are for ever & ever. May your feet never touch the mud and dirt of this terrible world. May you live and pass away like flowers as you are born is the constant prayer of your brother Vivekananda

স্বামীজীর লিখিত, একটি পত্রের প্রতিলিপি

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

Inaugural Address

By

SWAMI MADHAVANANDAJI MAHARAJ

President, Ramakrishna Math and Mission, Belur Math

at the Parliament of Religions
on 29th December, 1963

FRIENDS,

I am very happy to welcome you all here and inaugurate this Parliament of Religions in connection with the Birth Centenary of the Swami Vivekananda, in this very city of his nativity, which also heard Sri Ramakrishna preach the gospel of the harmony of all religions. People of various faiths from far and near have assembled here to find out the co-ordinating unity of the various faiths. If religion is to survive, and it must survive for the good of man, we have to compare notes and find out where we agree and on what basis or platform we can all unite and make a united front againt irreligion, which is gaining ground everywhere. At this time, when nations are arming themselves for wars of offence and defence, it is meet that the followers of various religions should voice the message of love, peace and brotherhood to a mad world.

The word 'religion' is used in a vague sense to signify both the diverse external manifestations of religiousness and inner spiritual excellence. Truly speaking, spirituality begins where religiousness ends. Swami Vivekananda, therefore, made a distinction between spirituality or the inner core of religion and formal religion, and he defined the former as the manifestation of the divinity already in man. He believed that from this point of view, 'Confucius, Moses, Pythagoras, Buddha, Christ, Mohammed, Luther, Calvin, and the Sikhs, Theosophy, Spiritualism, and the like—all these mean only the preaching of the Divine-in-man.'

When talking of the fundamentals of religion, we have to remember that in the past each great religion of the world had to adapt itself to changing times, places and cultures, so that sects multiplied, which claimed exclusive authenticity for themselves. But the very fact that they differ, while adhering to the same originators or the same books, points to some basic fact of unity. The modern problem is to find out this unity not only among the different sects of the same religion, but also among all the religions of the world. We have emphasised the differences long enough; now is the time to emphasise oneness.

When we speak of the unity of religions, we have mostly in mind the forms in which they originally issued out of their founders, or as they are presented in the original books. Here, again, we are aware that even these original religions of the world are never identical when taken in their totality; for even in those early days they differed in language and forms of worship. The Indian method of solving this difficulty was to accept variety and yet keep the eyes fixed on unity. Sri Ramakrishna declared that just as a grain of paddy has two parts, the

husk and the rice, so must each religion have its essentials and non-essentials to make it acceptable to ordinary human beings. That protective husk is also necessary just as much as a fence is necessary to protect a growing sapling. Besides, the growing mind has to ascend step by step, and the different forms of religion may well serve as the stages suitable for its expanding outlook. Forms cannot be ignored just because they are non-essential. Many essential portions of religions, again, though apparently contradictory, may not really be so, they may as well be complementary. 'I do not mean the different languages, rituals, books, etc., employed in various religions,' said Swami Vivekananda, 'but I mean the internal soul of every religion. I believe that they are not contradictory; they are supplementary.'

Thus we can lead a two-pronged attack against sectarianism by revealing their essential oneness and exposing the hollowness of their claim to exclusive possession of truth and the folly of magnifying differences and quarrelling over non-essentials. 'Our aim should be to widen the boundaries until they are lost sight of and to realise that all religions lead to God.'

This realisation of the sameness of the goal of all religions and this striving for bringing about their harmony, Swami Vivekananda inherited from his Master, Sri Ramakrishna, who proved by his own life and taught in clear terms that all religions are true. The history of India also impressed this upon Swamiji's mind. And this was the message that found expression in his very first speech at the Parliament of Religions at Chicago in 1893: 'My thanks, also, to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honour of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true.'

This idea of acceptance marks out and emphasises the Indian point of view. We not only tolerate but accept all forms of religion as true and help them in all possible ways. All religions have their honoured places here, for they fulfil some felt needs. The watchword of India's civilization is 'unity in variety', which is nature's plan of the universe itself. It is only through harmony and brotherhood and toleration and help that the future destiny of humanity can be assured. Starting from toleration and proceeding through sympathy and help, India found the true solution of sectarianism in nothing less than acceptance. This idea was boldly preached by Swami Vivekananda who said, 'The one great lesson, therefore, that the world wants most, that the world has yet to learn from India, is the idea not only of toleration, but of sympathy. Nay, more, not only should we be charitable, but positively helpful to each other, however different our religious ideas and convictions may be.'

That this was not mere empty sentiment, but was borne out by facts becomes evident to anyone reading the history of India. We can cite how the Hindus built churches for the Christians and mosques for the Mohammedans. The Parsee refugees were granted asylum here, and Christianity was allowed to spread under St. Thomas. The idea

underlying Indian culture was succinctly summed up and the motto for all future generations was supplied by the Ṛig-Vedic *mantra : 'Ekam sadviprā bahudhā vadanti*— Truth is one, but sages call it by various names.' This motto coloured all Indian endeavours in all fields of culture and civilization.

Along with a theoretical and practical recognition of the essential truth of all religions, some saints of the Middle Ages like Rāmānuja, Rāmdās, Kabīr, Nānak and Srī Caitanya consciously followed a process of fusion of the best elements of each faith. Some modern religious reformers also followed the same method. This, however, did not find favour with the generality of people, as every attempt along this line only created new sects without resolving fundamental differences. Swami Vivekananda did not stand for such eclecticism, which would reject certain features of a religion and borrow others from elsewhere, thus trying to create a body of religious beliefs and practices which would find universal acceptance. Rather, he accepted each religion in its totality, and if he spoke about the reform or rejection of some outer forms, it was from the motive of avoiding unnecessary communal friction, which cuts at the very root of spirituality. He stood for making the spiritual outlook fuller in content and more catholic and rational, without which few faiths have a chance of survival in the modern world of science and international dealings. Swami Vivekananda invited all to understand their own faiths better in the light of the rational philosophy of Vedānta and the psychological revelations of Yoga. He was not also against conscious assimilation, but he strongly condemned imitation. His method of establishing harmony was active cultivation of brotherhood along with firm adherence to one's own personal and sincere way of approaching God.

Sects there will be, just because men and their environments differ; but sects in themselves are not the causes of dissension, though often enough they fan the flame of organised brutality. Truly speaking, real harmony will never be achieved so long as the animal in man is not brought under control. Selfishness colours most of our behaviour and philosophies of life. Our neighbours are forced to adopt our points of view and our ways of life through personal contempt, social hatred and ostracism. Group selfishness also takes the form of political oppression, racial hatred and communal fanaticism. And all this is done in the name of spiritual regeneration. But politics and not religion is to be blamed for this sorry state of things.

The remedy for this is not less religion, but rather more of it. History has proved more than once that the conclusion of insincere treaties and pacts, which goes by the name of diplomacy, can never bring peace. Nor can any war—cold or hot—do so. For real universal brotherhood, religious people have to be up and doing in a united way, and not leave the matter in the hands of the politicians alone; for along with saving religion from irreligion, the onerous task of establishing lasting peace rests on their heads. The days of communal bickering must be left behind, for the simple reason that this only weakens the position of religion itself. In the modern age all religions must stand together or be crushed together by materialism. Too long have we allowed true religion to be exploited by designing people for their own selfish ends. Great souls first felt the impulse for love,

peace, charity, equality, and universal brotherhood. Later on, these became mere slogans in the hands of designing people, who reduced the universality of the saints and prophets into 'our fathers' religion', 'our national religion', 'our country's religion' and so on. And in the hands of the ignorant masses religion degenerated into fanaticism, mere protestation of faith and hatred of others, without any sincere effort for moral uplift and spiritual enlightenment. God's revelation of His love and glory through His prophets and incarnations thus becomes the worst weapon against God's own children.

To eschew this fanaticism, the world must be better educated and informed about the faiths all over the world. Historical research and comparative study can also separate the dross from the essential, and put us in a better frame of mind. The metaphysical presuppositions of sectarian doctrinaires have to be openly and critically examined; for true religion can very well stand such scrutiny. It will not do simply to refer to somebody's sayings or some ancient text, when the matter under discussion militates against the scientific facts of this life and offends against morality. The mythologies and ceremonial forms have also to be examined in the same way, without at the same time becoming a sort of scientfic fanaticism and running amuck against all real or supposed anomalies, irregularities and irrationalities. For we have to remember that each religion has its own natural appendages, without which the faith itself cannot survive. Under such circumstances we have to make concessions so long as such supposed irrationality is not fanatically directed against others. Have your unscientific mythologies, rituals and mysticism, if you feel that they really help you Godwards. But let others also have their own way, and do not shut for ever the light of reason from penetrating into the dark recesses of your mind.

While thus agreeing with science and reason up to the very limit of their possibilities, we cannot, however, forget that religion is after all an expression of the natural aspiration of man to reach God—a fact which no science or reason can deny, and which can be compromised under no circumstances. Looked at from this angle of vision, we are all at one, though our religions may bear different names, and even God may be called differently. If such an aspiration is true anywhere, it is true everywhere, so that all religions stand or fall together. The expressions of this aspiration may be evaluated differently, and some may be graded higher and some lower; still they are religions none the less, and they have their due scope relatively to the degree of developement of the human minds concerned and the civilizations by which they are sustained. The religion of the less advanced tribes is as much religion as that of the more civilized communities; a child's faltering talk is also a form of human language.

We can tackle the problem of amity either in the wider fields of human dealings or in personal life, or both together. But it is better to work up from the bottom upward. A saint can give a new tone to a society, and an individual life lived ideally can do much more for the cause of universal brotherhood than talking loudly from the house-top. Law can prevent something wrong, but creation of a value depends on the human heart itself. Planned progress must follow sincere individual effort. 'Iconoclastic reformers do no good to the world,'

said Swami Vivekananda. 'Help, if you can ; if you cannot, fold your hands and stand and see. Secondly, take man where he stands, and from there give him a lift. Give up all ideas that you can make man spiritual. There is no other teacher to you than your own soul.'

Sri Ramakrishna exemplified all these ideas in a practical way in his own life. He represented a type which future generations would have to strive to emulate, if the world is to have real spiritual and real universal brotherhood. And this is a field where religious men alone can succeed. Let them proceed step by step as sincere religious men, and not be led by secular men who have their own ulterior motives.

Before closing, let me pray to God that the deliberations that will be held in this Parliament of Religions may help us implement into the life of the world the spirit of tolerence and acceptance, of which Swami Vivekananda and his Guru Sri Ramakrishna were living embodiments. I wish you all success.

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

Vivekananda and Nivedita

By

KEDARNATH CHATTERJI

This land of ours has produced through the ages many seers, men of vision and many holy men who have renounced all that stands for temporal power and possessions and dedicated themselves, body and soul, to the attainment of the ultimate objective of salvation. A good few of them were preceptors of vast erudition and tremendous intellectual perception and there were quite a few others again who had the charismatic qualities that inspired all who came in contact with them with the ideals and objectives that they stood for. Most of these were Sannyasins, who had renounced all that this world stands for, and had attained pre-eminence above all princes and all men of wealth and standing through this renunciation.

We are celebrating this year the centenary of the birth of one such Sannyasin whose renunciation had been absolute and whose charismatic endowments amounted to a divine flame that lighted fires in the souls of those who came in close contact with him. The evidence of that divine flame is found today all over India, in cities, towns and villages and beyond the precincts of India in many lands overseas. And the message he gave to his disciples is being carried to the four corners of the earth in many languages and in myriad voices. It is a great achievement and it was made possible because he possessed, over and above the attributes of the true Sannyasin, the supreme dedication and zeal for the cause to which he devoted his life. And the foundations of the Order he founded through the blessings of his Master lay on the truest tenets of his religion, which exhort service to suffering humanity.

And the memory of this Sannyasin with this special attribute will be revered and treasured by all Indians so long as the ideals he enunciated are actively followed by the myriads that have faith in his teachings. For there was a difference in his teachings compared to that of other great Sannyasins and holy men.

His disciple Nivedita has put on record many of his sayings, like the following :

"Hitherto the great fault of our Indian Religion has lain in its knowing only two words—renunciation and Mukti. Only Mukti *here !* Nothing for the householder !"

"But these are the very people whom I want to help. *For are not all souls of the same quality ? Is not the goal of all the same ?" (Italics mine)*

"And so strength must come to the nation through education."[1]

This perception, derived from the teachings of his Master, attached those distinctive qualities to the mission, preachings and sayings of this Sannyasin, Vivekananda, from the other great ones. The uplift of the lowly and the allaying the miseries of the suffering masses were the basis of his mission. How intense his feelings were can be well illustrated by the following sayings of his :

"So long as even a single dog in my

[1] *The Master as I saw Him—p. 203*

country is without food, my whole religion will be to feed it."

And :

"May I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls."[2]

His zeal and inspiration for the cause undertaken by him amounted to a living and burning flame. So intense was the radiant heat emanating from this fire that consumed and dominated his whole existence that it lighted flames—as I have said before—in hundreds of souls giving them the inspiration and dedication to work for the cause all over the land and to spread its good tidings and to give of its service to all the suffering and ignorant poor, in village, town and city, even during the very short period he was with his disciples and followers. The span of life that was allocated for him was short indeed—less than forty years—but what was short in duration in that life was more than compensated by the intensity of its flame. This attribute he possessed as a lad.

Wrote Nivedita :

"Amongst the many quaint-seeming customs of the East, none is more deep-rooted than the prejudice against food cooked by one who is not respected. And on this point the Swami's Master was as sensitive as a woman. But what he would not eat himself he would give freely to his favourite disciple, for Noren, he said, was the "roaring fire," burning up all impurity. The core of divinity again, in this boy's nature was masculine in quality, as compared to his merely feminine."[3]

His crowning gift to his own people, according to Nivedita, was the last five and a half years of his life during which he stood for work without attachment, or work for impersonal ends, as one of the highest expressions of the religious life. "*And for the first time in the history of India an order of monks found themselves banded together, with their faces set primarily towards the evolution of new forms of civic duty.*"[4] *(Italics mine)*

What these monks have achieved, in completion of the work initiated by Swami Vivekananda, is writ large on the civic and national records of India in transition, from 1890 to the present day. In times of famine and pestilence they have given devoted service and in the cause of education and alleviation of distress they have striven hard for the tenets and ideals set up before them by Swami Vivekananda.

The concept of Hinduism, where Vivekananda was concerned, was wide and catholic. "A man was none the less a Hindu, for instance, in his eyes for being a member of the Brahmo or the Arya Samaj. The great Sikh *Khalsa* was one of the finest organisations ever created within the Mother Church and by her genius. .... There were, he held three different stratifications to be recognised in the Faith. One was that of the old historic Orthodoxy. Another consisted of the reforming sects of the Mohammedan period. And third came the reforming sects of the present period."[5] We find in the notes of a lecture delivered in London on November 23, 1895, the following :

"But this you must guard. Do not disturb the faith of any. For you must know that religion is not in doctrines. Religion lies in being and becoming, in realisation."[6]

---

[2] Letter ; Vol. V 136 of 9.7.1897

Much more can be written and has been written by others better epuipped than myself on this "roaring fire" and the flames and torches that it kindled. I myself have no clear recollection of the Swami though it is possible that I may have seen him during the callow years of my early youth. But my memories of two—Sister Nivedita, his direct disciple and Swami Vijnanananda, his brother disciple and associate in mission, are still vivid. And therefore I have tried to set forth as best as I could, the feeling of warmth and pride that I have felt about the Swamiji's Mission and his teachings. Separated though I am by broad sectarian boundaries, I have tried to illustrate what I felt was Universal and inspired by the Divine Spark, in both his teachings and his work, in order to offer my humble tributes to his hallowed memory.

Sister Nivedita I saw while I was in my teens. As I had to carry letters, proofs, etc., quite frequently, from my father to her, and as I have many memories of gracious words —sometimes of reproof at the gawkeries of a lad just out of schools—and kindly warmth of her approach to youthful queries, etc., I feel that I must write a few words about that noble soul.

It is well-known that she devoted her life in the service of humanity in India. But perhaps it is not realised how complete was her identification of her own self to the cause of Indian Nationalism and the Freedom of India.

Generations of women in Calcutta who have received education and training in deportment in the school she founded and in the building of which an American disciple, Sister Christine, gave her devoted services revere her hallowed memory. But there are other generations of men and boys that have passed away from mortal ken, who were helped in their fight for India's freedom by her to an extent that is not realised by the present generation.

Those were the days when the youth of India was being initiated and drilled in the cause of liberty. The British Government of India had taken alarm and were trying to stamp out the movement. The police and their spies were actively trying to put behind the bars all who were concerned in this fight, on the rides of the ruled. The methods followed by the police in trying to incriminate and bring within the clutches of the law those who were inspiring the people for the struggle by either word of mouth in speeches or by the written comment and exhortation, were not only extra-legal in character but were sometimes extremely crooked. A few of the senior police officers had come within the sphere of Sister Nivedita's influence, and through them she maintained a vigilant watch over these surreptitious plans to fabricate and plant incriminating evidence. I know that on two occasions this kind of planting was done in the editorial room of *The Prabasi* and *Modern Review* at 210/3/1, Cornwallis Street. On both occasions my father received warning that such a planting was to be done during the hours after midnight and that a police search will be made at dawn. On one case the warning came late at night through an unknown messenger who delivered a sealed note and vanished. In both cases the planted articles were found by my father and taken to the roof of the house, burnt and the ashes dispersed. The searches followed in each case and the anger of the police at the frustration was made more than evident by their behaviour.

There is proof in existence that she

helped in the escape of a famous politician of those days, though the issue has been made controversial by the disciples of the latter. Lesser fighters were helped by her, mostly indirectly, by money and by the giving of shelter for a few days. As regards her own views on the matter of Indian nationalism and freedom, she has written articles and she has spoken with clarity to others—some of them men of great eminence in other spheres, like Acharya Jagadish Chandra Bose.

It is this chapter of the nation-building activities of this devoted disciple of Vivekananda that still remains to be written. For her dedication to the cause of India and the intensity of her feelings at the injustices meted out to India are a measure of the radiant heat that emanated from the "roaring fire" personified by her Master, Swami Vivekananda.

3, 4, 5 and 6 are quotations from *The Master As I Saw Him*, by Sister Nivedita.

Swami Vivekananda and the Philosophy of our Nation

By

SWAMI CHIDATMANANDA

'The philosophy of a nation is important, for it foreshadows a nation's fate'; Swami Vivekananda, the patriot-saint of modern India, knew that very well and, therefore, while painting the philosophy of our Indian nation in the brightest colour possible and asking us never to forget it, he has pointed out the wrong conception we made about it, the degradation we brought in it and the false ideologies we associated with it. He knew that if this philosophy is kept vigorous, pure, and vital, the national life in spite of temporary sufferings and set-backs, can never really die out.

What, it may be asked, does tbe philosophy of a nation mean ? It is the keynote of the intricate music of the life of a nation, expressing itself in a variety of forms and symphonies. 'Each nation,' as Swamiji has said, 'has its own peculiarity and individuality, with which it is born. Each represents, as it were, one peculiar note in the harmony of nations ; and this is its very life, its vitality. In it is the backbone, the foundation, the bed-rock of the national life. In one nation political power is its vitality, as in England. Artistic life in another, and so on. I have seen that I cannot preach religion to Americans without showing them its practical effect on social life. I could not preach religion in England without showing the wonderful political changes the Vedānta would bring....' *What then is the philosophy of our nation ?* Answering this question, Swamiji says : 'Here in this blessed land the foundation, the backbone, the life centre is religion and religion alone. In India religious life forms the centre, the keynote of the whole music of national life.' He also knew that 'when the life-blood is strong and pure, no disease germ can live in that body. Our life-blood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right ; political, social, any other material defects, even the poverty of the land, will all be cured if that blood is pure.' And it was this task—to make his countrymen understand that this 'life-blood' must be kept flowing vigorous and pure—which the Swami took upon himself and as such, he has touched the philosophy of our nation at its best chords and has given it a new vitality, a reorientated practicality and a firmer rational foundation. It has been made suited to answer the needs of the modern times and to face the problems of present-day life squarely.

II

From time immemorial, before our written history started taking down notes for its record, India had started its magnificent researches in the realm of spirit and, through thick and thin, has stuck to it with more or less enthusiasm. Indian national life, while giving due importance to the other vocations of life at their proper places,

has pursued the way of a continuous struggle of spiritual seeking and finding. Reading the history of this struggle in India, Swami Vivekananda said, 'I stand in awe before the unbroken procession of scores of shining centuries, with here and there a dim link in the chain, only to flare up with added brilliance in the next; and there she is walking with her own majestic steps—my motherland—to fulfil her glorious destiny, which no power on earth or in heaven can check—the regeneration of man the brute into man the God.'

The search after and manifestation of divinity is the basic principle of the national philosophy of India. But with the passage of time, just as all things lose their original vigour and change shape and nature, this philosophy also underwent change because it fell in the hands of such persons who had neither the requisite capacity to conceive of the true import of the high spiritual ideal nor the necessary power to live up to it. And the result was disastrous. It is the common reading of the history that such things happen and it is for this only that new thoughts and movements become necessary to replace not only the outdated, worn out, and wrongly conceived ideologies, social customs and patterns of life, but also to re-orient and re-establish the old good and noble ideologies to their pristine glory, making them answer to the needs of the times and ridding them of the undesirable associations brought about them by their unscrupulous and unworthy custodians. It is for this readjustment that even *avatāras* have to come from time to time. Why is it that the *dharma* established by an *avatāra* does not last for all times? Is it the weakness of the *avatāras* that they establish a religion without the foresight necessary for its everlasting continuation? Why should vice prevail over virtue and why should God come into being in every age for the protection of the good and for the establishment of *dharma*? Because such is the law of nature that all things should undergo change. Even 'good' things start corrupting the world because, in the hands of the unscrupulous, these good things do not remain good anymore.

This is what happened with us also. Though there never was the dearth here of genuinely spiritual personalities, the unwary common people fell helpless victims in the hands of some clever manipulators and religion, instead of being an aid for emancipation and progress, became the instrument of oppressin and degradation. Looking at this phase of our religious transgressions, Swami Vivekananda woefully said: 'No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion as Hinduism.' But he did not blame religion for it because he knew the cause of this injustice done in the name of religion. He therefore said: 'The Lord has shown me that religion is not at fault, but it is the Pharisees and Sadducees in Hinduism, hypocrites, who invent all sorts of engines of tyranny in the shape of doctrines of *Pāramārthika* and *Vyāvahārika*.'

This leads us to an important conclusion: It is this that however high the philosophy, it must be made use of conscientiously. The guiding principle of religion, or as a matter of that any principle, should be first to understand and then to speak about or make use of it. First 'Be' and then 'Make', otherwise it will be like the case of a blind man leading the blind. But unfortunately,

this was totally forgotten in India for a time —and quite a long time—and the 'philosophy of the nation,' as we call it, fell into evil hands and the result was misery. Speaking about it all some sixty years ago, Swami Vivekananda said, 'The country has been slowly and slowly drowned in the ocean of *tamas* or dark ignorance. Where the most dull want to hide their stupidity by covering it with a false desire for the highest knowledge, which is beyond all activities, either physical or mental; where one, born and bred in lifelong laziness, wants to throw the veil of renunciation over his own unfitness for work; where the most diabolical try to make their cruelty appear, under the cloak of austerity, as a part of religion; where no one has an eye upon his own incapacity, but every one is ready to lay the whole blame on others; where knowledge consists only in getting some books by heart, genius consists in chewing the cud of others' thoughts, and the highest glory consists in taking the name of the ancestors: do we require any other proof to show that the country is being day by day drowned in utter *tamas*?'

III

There is no greater danger to an individual or a society than to lose sight of the realities, of the present needs and necessities and live in the false realm of self-idealism, sticking to wrongly conceived ideologies. One must be proud of the past if it is really worth it and should always draw inspiration from such heritage of his race as would make him vigorous, strong, and confident to fight the problems that confront him at the moment. This really proves the worth of looking to the past. But only boasting of the great deeds done by one's ancestors and trying to hide one's own worthlessness in the vainglorious satisfaction of being the descendants of great ones, are sure signs of imbecility and weakness. This was the catastrophe which betook us in the past and it is still not completely over with us. We are too much idealizing the philosophy and religion but making too little efforts to improve the present with them. Philosophy, if it does not inspire us to make the supreme efforts to rerch the greater heights, is no philosophy. Religion, if it does not help us to fight the battle of life successfully and again help us to transform the dross of matter in us into shining gold of spirit is no religion. Religion must give us success in this life and peace in the life hereafter. Swamiji, disgusted with the lame cxcuses we were making to hide our weakness and vain talks we were indulging in to justify our incapacity and backwardness, remonstrated: 'We talk foolishly against material civilization. The grapes are sour. Even taking all that foolishness for granted, in all India there are, say, a hundred thousand really spiritual men and women. Now, for the spiritualization of these, must three hundred million be sunk in savagery and starvation? Why should they starve? How was it possible for the Hindus to have been conquered by the Mohammedans? It was due to the Hindus' ignorance of material civilization. ... Material civilization, nay even luxury, is necessary to create work for the poor. Bread! Bread! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven! Pooh! India is to be raised, the poor are to be fed, education is to be spread, and the evil of priestcraft is to be removed. No priestcraft, no social tyranny! More bread, more opportunity for everybody!...

'Now, this is to be brought about slowly and by only insisting on our religion, and giving liberty to society. Root up priestcraft from the old religion and you get the best religion in the world. Do you understand me? Can you make a European society with India's religion? I believe it is possible and must be.'

IV

Religion has two aspect—personal and collective. Whereas it helps a man to constantly purify and heighten his inner personality, it also helps the society to keep to proper norms and standards which reflect the goodness and greatness of the collective life. Of course, the few that are really so high spiritually that they are mad after God or religion, may not look after any collective responsibility or duty, though it is often seen that even spiritually enlightened souls feel and work for their less enlightened brethren. But all others should see that religion plays its proper role in society also. The society should be so constituted as to be able to provide facility to its members to develop themselves well with mutual help and co-operation so that the community life may be lived happily—where there should be the satisfaction of the common needs of the people and the fulfilment of their higher aspirations.

As such, though the ultimate truth is that God and mammon cannot live together, religion, when working for collective life, has got a 'secular' aspect also. Do we not find that when a prophet is born, he gives out his teachings to the world, asking people to make the realization of God the sole aim of life, but round his teachings invariably grows a new society, a new community, a new culture, a new philosophy of living? Religion in its higher aspects is bound to be individualistic. A person who seeks God and God alone will always tend to cut himself off, from each and everything we call 'worldly'; but when we look at the general aspect of religion, we take into consideration the collective life, and here religion owes an obligation to the society towards its growth, development, and establishment. Religion in order to be effective must come to the aid of the ordinary common man fighting the battle of life in the same way as to the highly spiritual *yogin* who wants to realize God. 'Religion for a long time has come to be static in India', said Swami Vivekananda. 'What we want is to make it dynamic. I want it to be brought into the life of everybody. Religion, as it always has been in the past, must enter the palaces of the kings as well as the homes of the poorest peasants in the land. Religion, the common inheritance, the universal birthright of the race must be brought free to the door of everybody'. He wanted that religion and philosophy must not only be the fad or pastime of the privileged few but must come to help one and all. 'Religion', he said, 'to help mankind, must be ready and able to help him (man) in whatever condition he is, in servitude or in freedom, in the depths of degradation or on the heights of purity; everywhere, equally, it should be able to come to his aid. The principles of Vedānta, or the ideal of Religion, or whatever you may call it, will be fulfilled by its capacity for performing this great function.'

It was Swami Vivekananda who emancipated religion from the bondage which had been put round it by the 'Pharisees and Sadducees' and helped the philosophy of our nation rise out of the morass it had fallen into and made it virile and effective.

Religion is not a system of doctrines and dogmas. It is a way of life making for peace, love, harmony, and progress. Religion must not, therefore, be divorced from life but it should be associated with it. The philosophy of religion must be a philosophy of life—helping it in all its phases and stages of development leading ultimately to the realization of Truth, Expressing this harmonious outlook of her master of life and its activities, Sister Nivedita says : 'This is the realization which makes Vivekananda the great preacher of *karma*, not as divorced from, but as expressing *jnāna* and *bhakti*. To him, the workshop, the study, the farm-yard and the field, are as true and fit scenes for the meeting of God with man as the cell of the monk or the door of the temple. To him, there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality. All his words, from one point of view, read as a commentary upon this central conviction.'

This comprehensive outlook and this dynamic spirit in every field of life were what Swami Vivekananda wanted ; and we still, even after sixty years of his passing away, have not fully paid due heed to what he said. No doubt the country has undergone a vast change. The fetters of political bondage have dropped off from its body, the air of freedom has blown away the slavish mentality of looking: to others for help and succour ; great economic, social, and other advancements are being made, but not without a number of difficult problems requiring wise solution. Various ways and means are naturally, therefore, being taken recourse to and, in the process, numerous ideologies new and old, are crossing our minds. We are passing through a delicate transitional period of our history and only a wise and cautious handling of the present situation will determine a bright future. It is time, therefore, that we understood well the genius of our age-old national philosophy which will tone up our individual life admitting of all the broad ways of *jnāna*, *karma*, *bhakti* and *yoga* as the means to the attainment of *moksa* and, at the same time, also encourage the growth and strengthening of a vigorous and successful collective national life in accordance with the principles underlying that philosophy. Let us be inspired with the high ideal of realizing the Truth, and that in this life itself, but at the same time let us not neglect the society which is the veritable 'reflection of the Great Mother'. Renunciation should and must be encouraged but not *tamas*. Let us strengthen ourselvs with the glorious achievements of our great ancestors, but let us not be worthless idlers wallowing in the vainglory of our bygone days. What is needed is a dynamic spirit in every field of life—spiritual, social, and political. The whole society should be so organized that not only its members' health and life and property would be protected and improved, but that it would be able to provide facilities for higher achievements by the individuals ; and at the same time it will radiate strength and beauty of its ideology even outside its own boundary. It should be, as Dr. Radhakrishnan has said the other day, 'able not only to save itself but to extend its sheltering arms even to those who, though not belonging to it, seek its help and value its ideals'.

Some Views On Education

By

SWAMI VIRESWARANANDA

The present writer will endeavour in this article to interpret the views of Swami Vivekananda on Education from his published utterances on the subject. "Education," as Swami Vivekananda says, "is the manifestation of the perfection already in man. It is neither book learning nor diverse knowledge but the training by which the current and expression of the will are brought under control and become fruitful." It is a preparation for life. With the ancient Hindus it was not only a preparation for this life but also for the life to come. Both these aspects were given a proper place unlike the modern education which leaves the latter either as impracticable or as useless. Many, however, think that education in ancient India was one-sided, the religious side alone being developed ; that the Hindus' love for philosophy which taught the unreality of the world led them to neglect the practical side of life. But if we study the history of ancient India we find that this is not true. No doubt religion was given a greater prominence but all the same the practical side of life was also developed and given its proper place. Even from the oldest Upanishads we learn that the students were taught various other branches of knowledge also. From the conversation between Narada and Sanatkumara in the Chhandogya Upanishad we find that mathematics, politics, astronomy, logic, science, fine arts etc. formed parts of the curriculm. The Hindus had made great progress in all these subjects. But unfortunately owing to unfavourable historical circumstances the progress of the nation was arrested and no more development was made in these sciences. But with religion it was different. It was the central preoccupation of their life and this they could not give up. That is why religion still survives and that is what keeps us a nation yet. Had the political and social circumstances been more favourable India would have had a worthy place among the nations of the world even in the practical side of life as she has in religion.

The most characteristic feature of ancient Indian education was the relationship between the teacher and the disciple, which was considered even nearer than that between the father and the son. Nowhere do we find such an ideal relationship. The student entered the life of Brahmacharya at an early age. From that time till he finished his studies he lived with his teacher who regarded him as a member of his own family and undetook to teach him everything he knew. The teacher took no fees though at the end of the course the student usually made presents to him. The student on the other hand had to do some services to the teacher. He paid him great reverence and obeyed him implicitly. The life at the Guru's was not only a period of learning but also one of strict discipline which was intended to hold before the student an ideal of high morals and character. The student

was directed always to select such a teacher as was versed in the Vedas and was a knower of Brahman. At any rate the teacher was a man of great intellect, spirituality and moral character. Another characteristic of the ancient Indian education was that the teaching was concerned more with individuals than with a class. Every student was separately instructed by the teacher. This was advantageous, for every student could develop at his own pace according to his intelligence. The class consisted of a rather small number of students so that the teacher could give equal attention to everyone. Even when there were big universities they were each only a collection of number of such groups.

Let us now turn to the present system of education. It has not the good points of the ancient days while its defects are many ; Swamiji says : "An education which does not help one to fight out successfully the battle of life, which does not mould one's character nor create the idea of self-sacrifice for the commonweal, do you call it education ?"

The greatest defect of the present-day system which Swamiji pointed out was the loss of Shraddha. "We have had a negative education all along from our boyhood. We have only learnt that we are nobody. Seldom are we given to understand that great men were born in our country. Nothing positive has been taught to us. We do not even know how to use our hands and feet. ...We have learnt only weakness. We believe we are weak. So how can it be but that Shraddha is lost ? This loss of Shraddha has brought in all evils among us and is bringing in more and more." This Shraddha has to be brought back again—the Shraddha which emboldened Nachiketas to face Yama and question him. Truly does the Gita say, "अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति" "The ignorant, the man without Shraddha, he who doubts comes to grief."

How then to get back this Shraddha ? Swamiji's view was that we have to introduce again the worship of the great saints. Sri Ramachandra, Mahavira and Sri Krishna thundering forth the strong words of the Gita are to be held up as ideals to the people. The worship of the Divine Mother, the giver of strength and purity, the source of all power, must also be encouraged Our young children must be given books written in easy language containing stories from the Ramayana and Mahabharata, the Upanishads and also the lives of heroes like Mahavira, Bhishma, Pratap Singh, Shivaji etc. A history of ancient India written according to the modern ways of thinking must be prescribed as text-books for students of higher classes. This will bring before them the glory of the past and create self-reliance in them.

Let us next see what Swamiji's views were on the elements of a true Indian educational system. He laid great stress on three points : The period of Brahmacharya, Guru-griha-vasa and thirdly, religion. The period of Brahmacharya is quite essential. The student ought to be trained to practise absolute Brahmacharya. That is the basis of the whole future life and character-building. He was very much against the early marriage of boys, especially when they have not yet finished their student career. No one can stand the burden of two stages of life at one and the same time. It would mean killing the student by putting great strain on him. As to Guru-griha-vasa Swamiji says, "My idea of education is personal contact with the Guru. Living

with the Guru as of old is very essential. But it has to be put on a broader basis to suit the modern conditions and times. One should live from his very boyhood with a Guru whose character is like a blazing fire and should have before him a living example of the highest teaching. Without the personal life of a teacher there would be no education. Take your universities, what have they done ? They have not produced an original man. Every man of orginality that has been produced has been educated elsewhere and not in this country, or they have gone to the old universities to cleanse themselves of superstition." Some, however, criticise this system of Guru-griha-vasa as it is said to enslave the pupil's mind and produce a mentality devoid of originality and initiative. The fact that this system had produced great men, they explain away by saying that, that only shows the capability of the human mind to transcend all limitations and not the goodness of the system. In fact these remarks seem to be made loosely. There was nothing enslaving in it. The student was given full freedom and opportunities to develop in his own way, the authority of the teacher being exercised only in extreme cases of unmanageability. There was also nothing in it oppressing the mind of the people. All the rules framed were such as only tended to strict obedience and discipline which is very much lacking in the present system. The system in itself was good though in the carrying out of it defects might have crept in, which is a factor that cannot be avoided in any system unless the teachers have the ideal always before them. Again the capability of the human mind to transcend limitations being the same in all ages and climes, the fact that the old system produced more great men shows that it was much better than the modern.

The next point Swamiji emphasised upon was that education must be put on a religious basis. "Religion is the innermost core of education. It is the root thing." The modern system of education is not at all fit for imparting Brahma-vidya. Ancient India did not fail to put education on a religious basis, The Musalmans also had done so. But by an educational control pledged to religious neutrality in the matter of the Indian education, the problem of religious education will not be solved. This is the reason why National Universities are necessary.

Some of our leaders, however, think that religion has been the one cause of our downfall and unless it is banished or its ideals changed to suit our worldly purpose, no good will come to India. But these good people forget that each nation has one central fact which cannot be so easily neglected. With India it is religion. "We know that to the Indian mind there is nothing higher than religious ideals ; that is the keynote of Indian life and we can only work in the line of least resistance. Work in any line without first strengthening this would be disastrous. Our life-blood is religion—if it is strong and pure everything is right ; political social or any other material defects will all be cured if that blood is pure. You have withstood the shocks of centuries simply because you took great care of it, you sacrificed everything else for it. That is the national life-current. Follow it and it leads to glory. Give it up and you die." Every nation has a national purpose of its own and it dies when the main purpose of its life is hurt. The Indians have always fixed Moksha or Spiritual Independence as the goal ; this is

our national purpose and education is only a means to this end. Granting that God, Soul and Mukti are all false, yet these forces have determined our national character for thousands of years and is it possible to change it now? A change would mean death. Neither is our national ideal after all a mistaken one. If we compare ourselves with other nations we find that we are yet a nation living and that our life is in religion. Whatever change we wish to bring in this country, must be through religion. Then what is the cause of our degeneration? Our degeneration is not due to our religious ideal but due to the utter want of Dharma which allows man to seek for legitimate happiness in this world. In ancient days Dharma was compatible with religion. Buddhism however neglected the former and thrust the path of Moksha upon all. Such a thing is impossible for a nation as a whole. Renunciation can only result from a fully-lived life, from its experiences gathered and its values worked up. One rule cannot apply to all. No doubt Moksha is superior but the way to it is only through Dharma the fullness of ethical and practical life and unless one has gone through this he cannot attempt the life of Moksha, for he would be incapable of doing it and if he should in spite of that attempt, the result will only be destruction. We are now under a great self-deception. We think we are Sattvika whereas in reality we are Tamasika. Arjuna had also fallen into such a deception but was put on the right path by the Lord and the result was that he took one big stride towards what he was posing himself to be. क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते "*Yield not to unmanliness. O son of Pritha! Ill doth it become thee.*" "तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व"—"Therefore arise and win fame." These shall be the ideals for the generality of the nation at present. It is only by following this teaching of the Lord that we can rise again.

The Vedic religion had realised that one rule cannot apply to all and so it had made provision for Dharma, Artha, Kama and Moksha. The last they made the goal and the previous subservient to this and means to this final goal. Our aims and ideals are all right, but we have only to take care of the method by which to attain them. Our reformers are only too much aware of the degeneration that has set in and in their eagerness to throw out the rotten portion there is the danger of their inserting the knife so deep as to kill the patient also.

Another thing we have to guard curselves against is the tendency in us to lower the ideal by compromising it with the worldly life. We should never reconcile fleshy vanities with the highest ideals. That would be dragging God to the level of the apparent man. There is no use giving apologies for our sense-vanities. Rather we must rise one step higher in order to elevate to our chosen ideals than drag the ideals down to reconcile them with our imperfect conduct. This is also one of the causes that has led to our degeneration. It is this pretended adherence to our religious ideal which springs from a mere negative attitude towards it, that has caused our degeneration. True spirituality on the other hand is something positive. All legitimate and regulated material happiness is bound to follow it. It alone can give strength, courage and fearlessness so essential in life. From religion spring all other expressions of man such as art, science etc.

Next let us see what Swamiji has to say with respect to the method of imparting education. "No one can teach anybody," he used to say. The teacher spoils everything by thinking that he is teaching. Thus the Vedanta says that within man is all knowledge—even in a boy it is so—and it requires only an awakening and that much is the work of a teacher. We have to do only so much for the boys that they may learn to apply their own intellect to the proper use of their hands, legs, ears, eyes etc., and finally everything will become easy." Another point which he used to emphasise upon was that true education is gained by constant living in communion with nature. To support this he used to cite the story of Satyakama. The seats of education, the Ashramas of ancient days, were very much suited for this communion with Nature, as they were situated far from the turmoil of society on the outskirts of some forest or country-side. The new school of reformers however criticise this. They say that boys and girls must be educated in such places where they are surrounded by the condition of life in which they have to move and which they have to meet in later life. Hence according to them the colleges and universities must not be situated in localities far from the bustle of city life and from the temptations incidental to it; for boys brought up in isolation always succumb to the first temptation they come across. They go to greater extremes of laxity of character and looseness of behaviour than the former. In order that such a statement could be made we must have boys trained in isolation, side by side with those trained amidst society and observe their conduct in life. But we have not got the former class of boys and in the absence of such boys no comparison which is merely an imagination would be of any value. On the other hand, reason seems to prove the superiority of the former class. For one could fight the evil tendencies and circumstances better when he is spiritually stronger than when he is weaker. The sapling of a banyan tree requires hedging to protect it from cows, though when it grows to be a tree many cows may take shelter under it. To expose boys when their character is not yet built to the temptations of society is to undermine it from the very beginning.

A question may naturally arise: Was then Swamiji against our learning anything from the West? The reply is—certainly not. Nobody else was more aware of the deficiencies of our nation than he and this he wanted to make up by assimilating what is best in other nations. "You must understand this, my friend, that we have many things to learn from other nations. The man who says he has nothing more to learn is already at his last gasp. The nation that says it knows everything is on the very brink of destruction! 'As long as I live so long do I learn.' But one point to note here is that when we shall take anything from others we must mould it after our own way. We shall add to our stock what others have to teach but we must always be careful to keep intact what is essentially our own. We must mould it after our own fashion, always preserving in full our characteristic nationality."

The following quotation from the works of Swami Vivekananda gives us his views on an ideal education in a nutshell as it were: "With our education has to be combined modern Western sciences. Both these are necessary. What we want are Western science coupled with Vedanta, Brahma-

charya as the guiding motto and also Shraddha and faith in one's own Self; to study, independent of foreign control different branches of the knowledge that is our own, and with it the English language and Western science; we need technical education, and all else which may develop the industries, so that men, instead of seeking for service, may earn enough to provide for themselves, and save something against a rainy day."

Reprinted from Prabuddha Bharata, June, 1921.

ওকল্যাণ্ড (সানফ্রানসিস্কো)

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

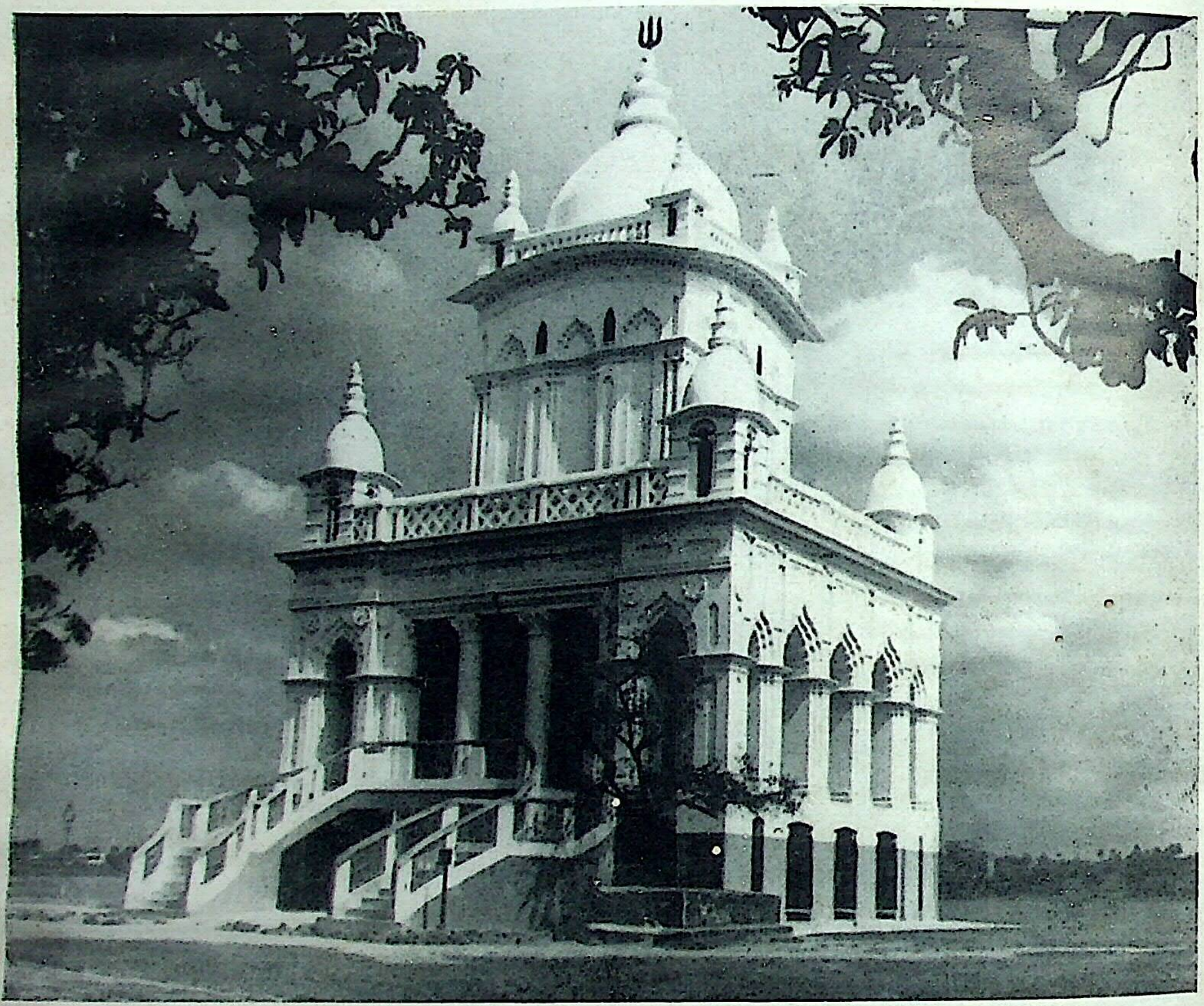

স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির—বেলুড় মঠ

"বেলুড়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব দেড় হাজার বছর ধরে চলবে এবং তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নেবে। মনে কোরোনা এটা আমি কল্পনা থেকে বলছি, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ (মিস ম্যাকলাউডের প্রতি)

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

Swamiji in the Contemporary American Press

Swami Vivekananda is a name to conjure with in certain circles of New York society today—and those not the least wealthy or intellectual. It is borne by a dusky gentleman from India, who for the last twelve months has been making name and fame for himself in this metropolis by the propagation of certain forms of Oriental religion, philosophy and practice. ... His manner is undoubtedly attractive, and he is possessed of a large amount of personal magnetism. One has but to glance at the grave, attentive faces of the men and women who attend his classes to be convinced that it is not the man's subject alone that attracts and holds his disciples.

—*The New York Herald*
(January, 1896)

There can be no question that the Swami is securing an influential following. Many clergymen have attended his lectures. Indeed, he was invited to lecture before the Dixon Society by Dr, Wright. Some of those who are his pupils are well-known in the city. Among the names of those recorded at the Swami's house were Ella Wheeler Wilcox, Mr. and Mrs. Francis Leggett, Madame Antoinette Sterling, Dr. Allen Day, Miss Emma Thursby and Professor Wyman. Mrs. Ole Bull is also one of his disciples. The Swami has just received an invitation from Mr. John P. Fox to lecture before the Harvard Graduate Philosophical Club.

—*The New York Herald*

He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation.

—*The New York Herald*

In certain respects the most fascinating personality was the Brahmin monk, Suami Vivakananda with his flowing orange robe, saffron turban, smooth-shaven, shapely, handsome face, large, dark subtle penetrating eye, and with the air of one being inly pleased with the consciousness of being easily master of his situation. His knowledge of English is as though it were his mother tongue . . .

—*Chicago Advocate*
(Sept. 28, 1893)

He is a great favourite at the Parliament, from the grandeur of his sentiments and his appearance as well. If he merely crosses the platform he is applauded; and this marked approval of thousands he accepts in a child-like spirit of gratification without a trace of conceit. ... At the Parliament of Religions they used to keep Vivekananda until the end of the programme, to make people stay till the end of the session. On a warm day, when a prosy speaker talked too long and people began going home by hundreds, the Chairman would get up and announce that Swami Vivekananda would give a short address just before the benediction. Then he would have the peaceable hundreds perfectly in tether. The four thousand fanning people in the Hall of Columbus would sit smiling and expectant, waiting for an hour or two of other men's speeches, to listen to Vivekananda for fifteen minutes. The Chairman knew the old rule of keeping the best until the last.

—*The Boston Evening Transcript*

Swami Vivekananda has been in Detroit recently and made a profound impression there. All classes flocked to hear him, and professional men in particular were greatly interested in his logic and his soundness of thought. He speaks English extremely well, and he is as handsome as he is good. The Detroit newspapers have devoted much space to the reports of his lectures. An editorial in the *Detroit Evening News* says,—More people will be inclined to think that Swami Vivekananda did better last night in his opera-house before than he did in any of his former lectures in this city. The merit of the Hindu's utterances last night lay in their clearness. He drew a very sharp line of distinction between Christianity and Christianity, and told his audience plainly wherein he himself was a Christian in one sense and not a Christian in another sense. He also drew a sharp line between Hinduism and Hinduism, carrying the implication that he desired to be classed as a Hindu only in its better sense. Swami Vivekananda stands superior to all criticism when he says, 'We want missionaries of Christ. Let such come to India by the hundreds and thousands. Bring Christ's life to us and let it permeate the very core of society. Let Him be preached in every village and corner of India.'

... Brother Vivekananda considers India the most moral nation in the world. Though in bondage, its spirituality still endures.

—*The Boston Evening Transcript*

But woe to the man who undertook to combat the monk on his own ground and that was where they all tried it who tried it at all. His replies came like flashes of lightning and the venturesome questioner was sure to be impaled on the Indian's shining intellectual lance. The workings of his mind so subtle

and so brilliant, so well-stored and so well-trained, sometimes dazzled his hearers, but it was always a most interesting study. Vivekananda and his cause found a place in the hearts of all true Christians.

—*The Iowa State Register*

Vivekananda is in many respects an excellent specimen of his race. He is very well proportioned as regards both body and brain. His face shows more marks of contentment than the visages of Russel Sage, Hetty Green, and many others of our multimillionaires. Firmness and conscientiousness are fully developed. Benevolence is quite conspicuous. The prominent eyes betoken superior memory of words and explain much of the eloquence he has displayed in his lectures. Being a graduate of the Calcutta University, he speaks English almost as perfectly as if he were a native of England.

—*Phrenological Journal of New York*

The Indian representative at the Parliament of Religions was Swami Vivekananda, a Hindu with a marvellous grasp of his subject, and an equally marvellous power of expression. His address on "The Hindu Idea of Soul" was of a most fascinating nature, the Hindu theology being most graphically and picturesquely explained. His dark, olive face with its dignity of expression, his little yet powerful figure clothed in a long brown garment with a crimson girdle, and his raven-black hair made him look what in truth he is—the Hindu Swami (the Master), the expounder of an Oriental Creed.

—*The London American*
(June 13, 1896)

There is combined in the Swami Vivekananda the learning of a university president, the dignity of an archbishop, with the grace and winsomeness of a free and natural child.

—*Unity (Los Angeles)*
(1899)

It is the voice of the ancient Rishis of the Vedas, speaking sweet words of love and toleration through the Hindu monk Vivekananda that held spellbound every one of those many hundreds.

Swami Vivekananda is even greater than his fame. As he stood upon the dais in his picturesque Kaftan of bright red, a stray curl of jet-black hair creeping from under the many folds of his orange turban, his swarthy face reflecting the brilliancy of his thoughts, his large expressive eyes, bright with the enthusiasm of a prophet, and his mobile mouth uttering, in deep melodious tones and

in almost perfect English, only words of love and sympathy and toleration, he was a splendid type of the famous sages of the Himalayas, a prophet of a new religion combining the morality of the Christians with the philosopy of the Buddhists.

—*The Brooklyn Standard*

The monk's eloquent and thoughtful discourse before the Parliament of Religions at the Chicago Fair, made a profound impression not only on the audience who listened to him, but on the religious world generally.

—*The Rutherford American*

Professor Vivekananda, who is of pleasing appearance and young, and being well-fitted with the ancient lore of India, made an address which captured the Congress, so to speak. There were bishops and ministers of nearly every Christian Church present and they were all taken by storm. The eloquence of the man with intellect beaming from his face, his splendid English in describing the beauties of her time-honoured faith, all conspired to make a deep impression on the audience.

—*The Press of America*

And yet this was the man who of all speakers on the platform of the Parliament of Religions awoke the most uproarious applause and was called back again and again.

—*The Interior Chicago*

But eloquent as were many of the speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and its limitations as the Hindu monk. ... *He is an orator by Divine Right*, and his strong intelligent face in its picturesque setting of yellow and orange was hardly less interesting than those earnest words and the nice rhythmical utterance he gave them.

* * *

He has preached in clubs and churches until his faith has become familiar to us. ... His culture, his eloquence, and his fascinating personality have given us a new idea of Hindu Civilisation. ... His fine, intelligent face and his deep, musical voice, prepossess one at once in his favour. ... He speaks without notes, presenting his facts and his conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity, and rising often to rich and inspiring eloquence.

—*The New York Critique*

One of the most popular of these Hindu representatives was Swami Vivekananda. ... He showed himself to be one of the best orators at the Congress, speaking faultless English without notes, and with an utterance that many of his hearers declared would of itself have been music had you not understood a word.

Since the Parliament he has spoken to immense audiences in many towns and cities, who have but one opinion of praise and are enthusiastic over his magnetic power and his way of giving light and life to every subject he touches upon. Naturally his views of great questions, coming like himself from the other side of the globe, are refreshing and stirring to American people. His hearers are pleasantly astonished when the dark-hued, dark-haired, dignified man rises in rich yellow robes and speaks their own language with fluency, distinctness and correctness.

* * *

It is upon matters religious and philosophical (and necessarily spiritual) that the Eastern brother is most impressive, and, while outlining the duties that follow the conscientious consideration of the great moral law of nature, his softly modulated tones, a peculiarity of his people, and his thrilling manner are almost prophetic. He speaks with marked deliberation, except when placing before his listeners some moral truth, and then his eloquence is of the highest kind.

* * *

The speaker concluded in an eloquent manner. Throughout his speech was simple, but whenever he indulged in imagery it was delightfully poetic, showing that the Eastern brother has been a close and attentive observer of the beauties of nature. His excessive spirituality is a quality which makes itself felt with his auditors, for it manifests itself in the love for animate and inanimate things, and in the keen insight into the mysterious workings of the divine law of harmony and kindly intentions.

* * *

The lecture last night was less descriptive than preceding ones, and for nearly two hours Vivekananda wove a metaphysical texture on affairs human and divine, so logical that he made science appear like commonsense. It was a beautiful logical garment that he wove, replete with as many bright colours and as attractive and pleasing to contemplate as one of the many-hued fabrics made by hand in his native land and scented with the most seductive fragrance of the Orient. The dusky gentleman uses poetical imagery as an artist uses colours, and the hues are laid on just where they belonged, the result being somewhat bizarre in effect and yet having a peculiar fascination. Kaleidoscopic were swiftly succeeding logical conclusions and the deft manipulator was rewarded for his efforts from time to time by enthusiastic applauses.

—*Detroit Free Press*

Swamiji in the Contemporary English Press

The Swami Vivekananda is a striking figure with his turban and his calm but kindly features . . . His face lights up like that of a child, it is so simple, straightforward and honest.

—The West Minister Gazette

All sorts and conditions of men are to be found in London, but probably the great city contains just now none more remarkable than the philosopher, who represented the Hindu religion at the Parliament of Religions at Chicago in 1893. . . . The philosopher, who elected to be known as Swami Vivekananda, believes he has a message for the world, and the burden of his theme is a univesal religion.

—The Century House
(June, 1896)

The Swami is one of the living exponents of the Vedanta Philosophy; his manner, distinguished appearance, the ease with which he expounds a profound philosophy, his mastery of the English tongue, explain the great cordiality with which the Americans received him and the fact that they almost compelled him to remain a year or two among them. He cannot be said to belong to any religion, since his life is one of independent thought which draws from all religions.

—The London Daily Chronicle
(June 10, 1896)

Vivekananda, the popular Hindu monk, whose physiognomy bore the most striking resemblance to the classic face of Buddha, denounced our commercial prosperity, our bloody wars, and our religious intolerance, declaring that at such a price the mild Hindu would have none of our vaunted civilisation.

—The London Daily Chronicle

Since the days of Ram Mohan Roy, with the single exception of Keshub Chandra Sen, there has not appeared on an English platform a more interesting Indian figure than the Hindu who lectured in Princes' Hall. . . . In the course of his lecture, he made some remorselessly disparaging criticism on the work that factories, engines, and other inventions and books were doing for man compared with half-a-dozen words spoken by Buddha or Jesus. The lecture was evidently quite extemporaneous, and was delivered in a pleasing voice free from any kind of hesitation.

—The Standard

Swamiji in the Eyes of the West

MISS S. E. WALDO

(Sister Haridasi)

To those who were fortunate enough to be there (Thousand Island Park) with the Swami, those were weeks of ever-hallowed memory, so fraught were they with unusual opportunity for spiritual growth. No words can describe what that blissful period meant (and still means) to the devoted little band who followed the Swami from New York to the island in the St. Lawrence, who daily served him with joy and listened to him with heart-felt thankfulness. His whole heart was in his work and he taught like one inspired. . . .

None of us can ever forget the sense of uplift, the intense spiritual life of those hallowed hours. The Swami poured out all his heart at these times, his own struggles were enacted again before us; the very spirit of his Master seemed to speak through his lips, to satisfy all doubts, to answer all questioning, to soothe every fear......

The Swami did not appear to address us directly, but rather seemed to be speaking to himself in words of fire, as it were, so intense were they, and so convincing, burning into the very hearts of his listeners never to be forgotten. . . .

It was a perpetual inspiration to live with a man like Swami Vivekananda. From morning till night it was ever the same, we lived in a constant atmosphere of intense spirituality. Often playful and fun-loving, full of merry jest and quick repartee, he was never for a moment far from the dominating note of his life.

MRS. MARY C. FUNKE

(A well-known society woman of Detroit)

I can see him yet as he stepped upon the platform, a regal, majestic figure, vital, forceful, dominant, and at the first sound of the wonderful voice, a voice all music—now like the plaintive minor strain of an Eolian harp, again, deep, vibrant, resonant—there was a hush, a stillness that could almost be felt, and the vast audience breathed as one man.

The Swami gave five public lectures and he held his audiences, for his was the group of the 'master hand,' and he spoke as one with authority. His arguments were logical, convincing, and in his most brilliant oratorical flights never once did he lose sight of the main issue—the truth he wished to drive home.

* * *

His last public appearance in Detroit was at the Temple Beth El, of which the Rabbi Louis Grossman, an ardent admirer of the Swami, was the pastor. It was Sunday evening and so great was the crowd that we almost feared a panic. There was a solid line reaching far out into the street and hundreds were turned away. Vivekananda held a large audience spell-bound, his subject being 'India's Message to the West,' and 'The Ideal of a Universal Religion.' He gave us a most brilliant and masterly discourse. Never had I seen the Master look as he looked that night. There was something in his beauty—not of earth. It was as if the spirit had almost burst the bonds of flesh and it was then that I first saw a foreshadowing of the end. He was much exhausted from years of overwork, and it was even then to be seen that he was not long for this world. I tried to close my eyes to it, but in my heart I knew the truth. He had needed rest but felt that he must go on.

Hon. Mr. Merwin-Marie Snell

(President of the Scientific Section, Parliament of Religions)

No religious body made so profound an impression upon the Parliament and the American people at large as did Hinduism. . . . And by far the most important and typical representative of Hinduism was Swami Vivekananda, who, in fact, was beyond question the most popular and influential man in the Parliament. He frequently spoke, both on the floor of the Parliament itself and at the meetings of the Scientific Section, over which I had the honour to preside, and on all occasions he was received with greater enthusiasm than any other speaker, Christian or 'Pagan'. The people thronged about him wherever he went and hung with eagerness on his every word. . . . The most rigid of orthodox Christians say of him, 'He is indeed a prince among men.'

Rev. J. H. Barrows

(Chairman of the General Committee of Parliament of Religions)

Swami Vivekananda exercised a wonderful influence on his auditors.

Mrs. Ella Wheeler Wilcox

(One of the foremost poets and writers of America)

Twelve years ago I chanced one evening to hear that a certain teacher of philosophy from India, a man named Vivekananda, was to lecture a block from my home in New York.

We went out of curiosity (the man whose name I bear and I) and before we had been ten minutes in the audience we felt ourselves lifted up into an atmosphere so rarified, so vital, so wonderful, that we sat spellbound and almost breathless to the end of the lecture.

When it was over we went out with new courage, new hope, new strength, new faith, to meet life's daily vicissitudes. 'This is the philosophy, this is the idea of God, the religion which I have been seeking,' said the Man. And for months afterwards he went with me to hear Swami Vivekananda explain the old religion and to gather from his wonderful mind jewels of truth and thoughts of helpfulness and strength. It was that terrible winter of financial disasters, when banks failed and stocks went down like broken balloons and businessmen walked through the dark valleys of despair and the whole world seemed topsy-turvy—just such an era as we are again approaching. Sometimes after sleepless nights of worry and anxiety, the Man would go with me to hear the Swami lecture, and then he would come out into the winter gloom and walk down the street smiling and say, 'It is all right. There is nothing to worry over.' And I would go back to my own duties and pleasures with the same uplifted sense of soul and enlarged vision.

When any philosophy, any religion, can do this for human beings in this age of stress and strain, and, when, added to that, it intensifies their faith in God and increases their sympathies for their kind and gives them a confident joy in the thought of other lives to come, it is good and great religion.

MISS HARRIET MONROE

(A well-known poetess of America)

...But the handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpiece. His personality, dominant, magnetic; his voice, rich as a bronze bell; the controlled fervor of his feeling; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time—these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch.

REV. W. H. THOMAS

(In a letter published in the Wisconsin State Journal, Nov. 18, 1893)

Of the many learned men in the East who took part in the great World's Parliament of Religions, Vivekananda was the most popular favourite, and when it was known that he was to speak thousands were turned away for want of room. Nor was it curiosity alone that drew the masses; for those who heard him once were so impressed by the magnetism of his fine presence, the charm and power of his eloquence, his perfect command of the English language and the deep interest in what he had to say, that they desired all the more to hear him again. It will be the opportunity of a life time for the cities of our land to see and hear this noble, earnest, loving Brahman, dressed in the costume of his order, telling the true story of the religion and customs of his far-off country.

Martha Brown Fincke

(Prabuddha Bharata, Sept. 1936)

...On the Bulletin for November was the name of Swami Vivekananda who was to give two evening lectures. That he was a Hindu monk we knew, nothing more; for the fame he had won in the recent Parliament of Religions had not reached our ears. Then an exciting piece of news leaked out; he was to live at our house, to eat with us, and we could ask him questions about India. Our hostess's breadth of tolerance may be seen in receiving into her house a man with dark skin, whom the hotel had doubtless refused to admit. As late as 1912 the great poet Tagore with his companion wandered through the streets of New York looking in vain for shelter!..

The day came, the little guest-room was ready, and a stately presence entered our home. The Swami's dress was a black Prince Albert coat, dark trousers and yellow turban wound in intricate folds about a finely shaped head. But the face with its inscrutable expression, the eyes as full of flashing light, and the whole emanation of power, are beyond description. We were awed and silent. Our hostess, however, was not one to be awed, and she led an animated conversation. I sat next to the Swami, and with my superfluity of reverence found not a word to say.

Of the lecture that evening I can recall nothing. The imposing figure on the platform in red robe, orange cord, and yellow turban, I do remember, and the wonderful mastery of the English language with its rich sonorous tones, but the ideas did not take root in my mind, or else the many years since then have obliterated them. But what I do remember was the symposium that followed.

To our house came the College president, the head of the philosophy department, and several other professors, the ministers of the Northampton Churches, and a well-known author. In a corner of the living-room we girls sat as quiet as mice and listened eagerly to the discussion which followed. To give a detailed account of this conversation is beyond me, though I have a strong impression that it dealt mainly with Christianity and why it is the only true religion. Not that the subject was the Swami s choosing. As his imposing presence faced the row of black-coated and somewhat austere gentlemen, one felt that he was being challenged. Surely these leaders of thought in our world had an unfair advantage. They knew their Bibles thoroughly and the European systems of philosophy, as well as the poets and commentators. How could one expect a Hindu from far-off India to hold his own with these, master though he might be of his own learning? The reaction to the surprising result that followed is my purely subjective one, but I cannot exaggerate its intensity.

To texts from the Bible, the Swami replied by other and more apposite ones from the same book. In upholding his side of the argument he quoted English philosophers and writers on religious subjects. Even the poets he seemed to know thoroughly, quoting Wordsworth and Thomas Gray (not from the well-known *Elegy*). Why were my sympathies not with those of my own world? Why did I exult in the air of freedom that blew through the room as the Swami broadened the scope of religion till it embraced all mankind? Was it that his words found an echo in my own longings, or was it merely the magic of his personality. I cannot tell, I only know that I felt triumphant with him.

In speaking with Swami...at the Belur Math, he said that to him Swami Vivekananda personified Love. To me that night he personified Power. I think that I can explain this from my later knowledge. No doubt these great men of our College world were narrow-minded, of closed convictions, "wise in their own conceits." How could they accept the saying "Whosoever comes to Me through whatsoever form, I reach him?" At Chicago the Swami had recently felt the rancour of Christian missionaries, and undoubtedly his accents took on an austerity as he felt the same spirit in these representatives of Western learning. To them Love would not appeal, but Power can awe even when it does not force agreement. The discussion, beginning with the utmost courtesy, became less cordial, then bitterness crept in, a resentment on the part of the champions of Christianity as they felt that it was "thumbs down" for them. And truly it was. The repercussion of the triumph that filled me then is with me to this day. ...

JOSEPHINE MACLEOD

(Prabuddha Bharata, December 1949)

On the twenty-ninth of January, 1895, I went with my sister to 54 West 33rd Street, New York, and heard the Swami Vivekananda in his sitting room where were assembled fifteen or twenty ladies and two or three gentlemen. The room was crowded. All the arm chairs were taken; so I sat on the floor in the front row. Swami stood in the corner. He said something, the particular words of which I do not remember, but instantly to me that was truth, and the second sentence he spoke was truth, and the third sentence was truth. And I listened to him for seven years and whatever he uttered was to me truth. From that moment life had a different import. It was as if he made you realize that you were in eternity. It never altered. It never grew. It was like the sun that you will never forget once you have seen......

I always felt that after Vivekananda, Mrs. Roethlisberger was the most spiritual person I ever met. It was she who took us to him. Swamiji had a great place for her also. One day she and I went to the Swami and said, "Swami, will you tell us how to meditate?" He said, "Meditate on the word

'OM' for a week and come again and tell me." So after a week we went back and Mrs. Roethlisberger said, "I see a light." He said, "Good, keep on." "O no, it is more like a glow at the heart." And he said to me, 'Good, keep on." That is all he ever taught me. But we had been meditating before we ever met him, and we knew the Gita by heart. I think that prepared us for recognition of this tremendous life force which he was. His power lay, perhaps, in the courage he gave others. He did not ever seem to be conscious of himself at all. It was the other man who interested him. "When the book of life begins to open, then the fun begins," he would say. He used to make us realize there was nothing secular in life; it was all holy. "Always remember, you are incidentally an American, and a woman, but always a child of God. Tell yourself day and night who you are. Never forget it." That is what he used to tell us. His presence, you see, was dynamic. You cannot pass that power on unless you have it, just as you cannot give money away unless you have it. You may imagine it, but you cannot do it.

* * *

At Belur Math one day, while Sister Nivedita was distributing prizes for some athletics, I was standing in Swamiji's bedroom at the Math, at the window, watching and he said to me, "I shall never see forty." I, knowing he was thirty-nine, said to him, "But Swami, Buddha did not do his great work until between forty and eighty." But he said, "I delivered my message and I must go." I asked, 'Why go?" and he said, "The shadow of a big tree will not let the smaller trees grow up. I must go to make room."

Afterwards I went again to the Himalayas. I did not see Swami again. I went back to Europe for the King's Jubilee. As I said, I never was a disciple, only a friend, but I remember in my last letter to him in April, 1902, as I was leaving India—I was never to see him again—I distinctly remember writing in this good-bye letter the one sentence, "I swim or sink with you." I read that over three times and said, "Do I mean it?" And I did. And it went. And he received it, though I never had an answer. He died July 4, 1902.

Sister Christine

(From "Reminiscences of Swami Vivekananda")

Swami Vivekananda as I saw him.

Now and then, at long intervals of time, a being finds his way to this planet who is unquestionably a wanderer from another sphere; who brings with him to this sorrowful world some of the glory, the power, the radiance of the far distant region from which he came. He walks among men, but he is not at home here. He is a pilgrim, a stranger, he tarries but a night.

He shares the life of those about him, enters into their joys and sorrows, rejoices with them, mourns with them, but through it all, he never forgets who he is, whence he came, or what the purpose of his coming. He never forgets his divinity. He remembers that he is the great, the glorious, the majestic Self. He knows that he came from that ineffable, supernal region which has no need of the sun or moon, for it is illumined by the Light of lights. He knows that he was long before the time when—"all the sons of God sang together for joy."

Such a one, I have seen, I have heard, I have revered. At his feet I have bid my soul's devotion.

Such a being is beyond all comparison, for he transcends all ordinary standards and ideals. Others may be brilliant, his mind is luminous, for he had the power to put himself into immediate contact with the source of all knowledge. He is no longer limited to the slow processes to which ordinary human beings are confined. Others may be great, they are great only as compared with those in their own class. Others may be good, powerful, gifted, having more of goodness, more of power, more of genius than their fellow-men. It is only a matter of comparison. A saint is more holy, more pure, more single-minded than ordinary men. But with Swami Vivekananda, there could be no comparison. He was a class by himself. He belonged to another order. He was not of this world. He was a radiant being who had descended from another, a higher sphere for a definite purpose. One might have known that he would not stay long.

Is it to be wondered at that nature itself rejoices in such a birth, that the heavens open and angels sing paeans of praise ?

Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived on this earth at the same time, and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet.

The Master and the Message

...To those who have heard much of the personal appearance of Swami Vivekananda it may seem strange that it was not this which made the first outstanding impression. The forceful virile figure which stepped upon the platform was unlike the emaciated, ascetie type which is generally associated with spirituality in the West. A sickly saint everyone understands, but who ever heard of a powerful saint ? The power that emanated from this mysterious being was so great that one all but shrank from it. It was overwhelming. It threatend to sweep everything before it. This one sensed even in those first unforgettable moments. Later we were to see this power at work. It was the mind that made the first great appeal, that amazing mind ! What can one say that will give even a faint idea of its majesty, its glory, its splendour ? It was a mind so far transcending other minds, even of those who rank as geniuses, that it seemed different in its very nature. Its ideas were so clear, so powerful, so transcendental that it seemed

incredible that they could have emanated from the intellect of a limited human being. Yet marvellous as the ideas were and wonderful as was that intangible something that flowed out from the mind, it was all strangely familiar. I found myself saying, "*I have known that mind before.*" He burst upon us in a blaze of reddish gold, which seemed to have caught and concentrated the sun's rays. He was barely thirty, this preacher from far away India. Young with an ageless youth and yet withal old with the wisdom of ancient times. For the first time we heard the age-old message of India, teaching the *atman*, the true self.

The audience listened spell-bound while he wove the fabric as glowing and full of colour as a beautiful Kashmir shawl. Now a thread of humour, now one of tragedy, many of serious thought, many of aspiration, of lofty idealism, of wisdom. Through it all ran the woof of India's most sacred teaching : the divinity of man, his innate and eternal perfection ; that this perfection is not a growth, nor a gradual attainment, but a present reality.......He stood on the platform of the Unitarian Church pouring forth glorious truths in a voice unlike any voice one had ever heard before, a voice full of cadences, expressing every emotion, now with a pathos that stirred hitherto unknown deeps of tragedy, and then just as the pain was becoming unbearable, that same voice would move one to mirth only to check it in a midcourse with the thunder of an earnestness so intense that it left one awed, a trumpt call to awake. One felt that one never knew what music was until one heard that marvellous voice.

...Those who came to the first lecture at the Unitarian Church came to the second and to the third, bringing others with them. "Come," they said, "hear this wonderful man. He is like no one we have ever heard," and they came until there was no place to hold them. They filled the room, stood in aisles, peered in at the windows. Again and again he gave his message, now in this form, now in that, now illustrated with stories from the Râmâyanâ and Mahâbhârata, now from the *purânas* and folklore. From the Upanishads he quoted constantly, first chanting in the original Sanskrit, then giving a free poetic translation. Great as was the impression which his spoken words made, the chanting produced an even greater effect. Unplumbed deeps were stirred ; and as the rhythm fell upon the ear, the audience sat rapt and breathless. Our love for India came to birth, I think when we first heard him say the word, "India," in that marvellous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of five letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, *heimweh*. and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic power of creating love in those who heard it. Ever after, India became the land of heart's desire. Everything concerning her became of interest—became living—her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts. her scriptures. And so began a new life, a life of study, of meditation. The centre of interest was shifted.

ERIC HAMMOND

(*Vedanta Kesari, May 1922*)

.........We found ourselves in a big drawing room or hall, filled almost to overflowing by smart people in evening dress. Some courteous and obliging person ushered us close to a platform where one or two chairs were vacant. The position was conspicuous and so, alas! were we. Our overcoats were dripping with rain, nor were we otherwise clothed in fine raiment; not anticipating a summons to so distinguished a gathering. Most of those present were, we discovered, school masters and school mistresses, tutors and the like. The subject announced for the lecture was "Education." Soon he, Swamiji, appeared. He had little, if any notice, and his speech could not have been in any wise prepared. Yet, then, as always, he proved himself more than equal to the occasion. Collected, calm, self-possessed, he stood forward. A Hindu, primed in heart and tongue with Hindu lore and Hindu faith, backed by the prestige of an ancient civilization and culture which inspired him. It was a novel sight, a memorable experience. His dark skin, his deep glowing eyes, even his costume, attracted and fascinated. Above all, eloquence acclaimed him, the eloquence of inspiration. Again, his surprising command of the English language delighted and held his audience, an audience it must be remembered which consisted largely, as we have said, of men and women whose profession it was to teach English students their mother tongue and through the medium of that tongue instruct them in other branches of knowledge. More, Swamiji soon showed that he was equally versed in history and political economy. He stood among these people on their own ground. Without fear, beseeching no favour, he dealt them blow upon blow enforcing the Hindu principle that the teacher who taught for the money-making was a traitor to the highest and deepest truth. "Education is an integral part of religion and neither one nor the other should be bought nor sold." His words, rapier-like, pierced the armour of scholastic convention; yet no bitterness spoilt his speech. This Hindu, cultured, gracious with his notable smile that disarmed unkindly criticism, held his own and made his mark. He had come, sent by the spirit of Shri Ramakrishna, to make that mark; and he had succeeded at the first attempt. The idea that teachers should work with their pupils for love, and not for the love of lucre, not even for the love of livelihood.

EDITH ALLAN (Viraja Devi)

(*Vedanta Kesari, September 1924*)

How little we understood the Swamiji? We had no knowledge of what he really was. Sometimes he would tell me things and I in the abundance of my ignorance would tell him I did not think that way and he would laugh and

say, "Don't you ?" His love and toleration was wonderful. Swamiji was not in good health—much lecturing told upon him. He used to say he did not like platform work, "Public lecturing is killing. At eight o'clock I am to speak on 'love'. At eight o'clock I do not feel like love." After he finished lecturing in Alameda, the Swami went to camp Taylor and a little later started for the east and we in California never saw him again. Yet we who were blessed by his presence cannot feel he is entirely gone from us. He lives in our memories and in teachings he gave us. Before he left, he told me if I never got into psychic difficulty again to call on him and he would hear me wherever he was even though hundreds of miles away and it may be he can hear even now.

বিদেশে আমাদের বড়ো দশজন খরিদ্দার

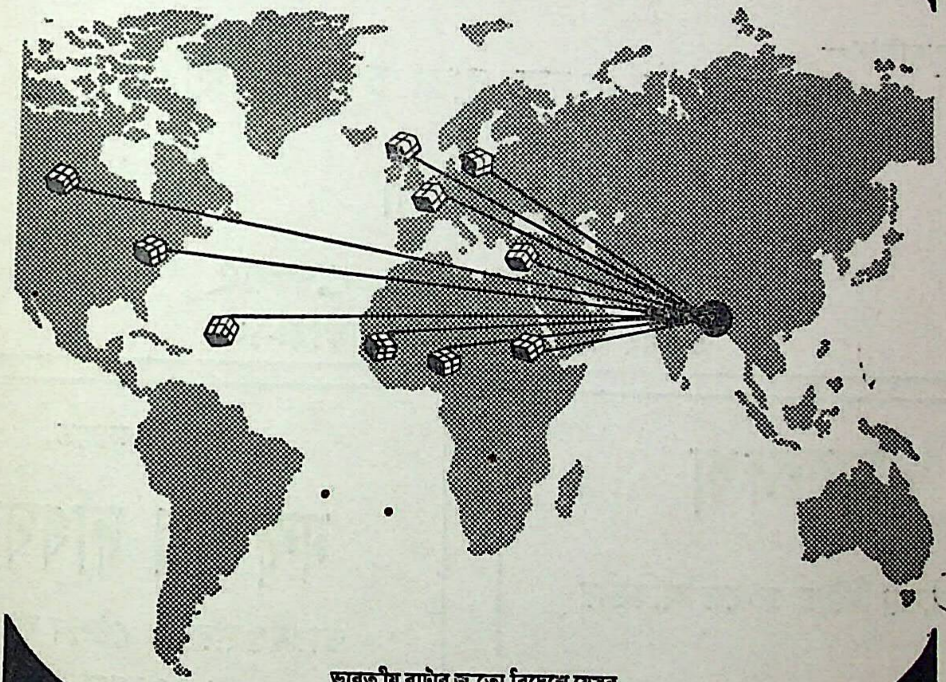

ভারতীয় বাটার জুতো বিদেশে যেসব
জায়গায় রপ্তানী করা হয়, তাদের প্রথম
দশটির নাম: যুক্তরাজ্য, আমেরিকার
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, বেলজিয়াম,
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নাইজিরিয়া, সিয়েরা
লিওন, সাইপ্রাস এবং সুদান।
১৯৬২ সালের জানুয়ারি থেকে
ডিসেম্বর এই দশটি দেশে
মোট ৩,৭০৬,৭০০ জোড়া জুতো
রপ্তানী করা হয়েছে।

Bata

ফোন :—২২-৮৬৯৯

শ্রদ্ধা জানালাম—

চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা

ও

চশমা

বর্ম্মন এণ্ড কোং

৩৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সন্দেশ

ভারতের মিষ্টান্ন জগতে অদ্বিতীয়

★

শ্রীনাথ নাগ

আবিষ্কারক ডাক্তারি সন্দেশ

৫, নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সত্যমেব জয়তে

নন্দলাল দধিঘর

ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশন বাজার

২৪ পরগণা

সবার প্রিয় নন্দলালের অদ্বিতীয়

দধি ও মিষ্টান্ন

প্রোঃ নন্দলাল ঘোষ এণ্ড সন্স

বিঃ দ্রঃ—আমরা অর্ডার অনুযায়ী দধি ও মিষ্টান্ন সরবরাহ করিয়া থাকি

"Live in the world — heart to God and hand to work."

—*Swami Vivekananda*

★

Space donated

by

M. S. RUBBER CO.

CALCUTTA-6

With best Compliments of :

EMSONS PHARMACEUTICALS PRIVATE LTD.

144A, RASH BEHARI AVENUE,

CALCUTTA-29

With Compliments of :

M/s TRANSPORT DEVELOPMENT CORPORATION

132, DHARMATALLA STREET
CALCUTTA-13

PHONE NO : 24-4556

Service is the only Product.

Phone : 24-2852

CHATTERJEE PAUL & CO.

26, Nirmal Chunder Street,
CALCUTTA-12
(FORMERLY WELLINGTON STREET)

Dealers in :

TATA STEEL JOIST, TEE, ANGLE,
BAR, ROD, ASBESTOS &
COLLAPSIBLE GATE ETC.

চ্যাটার্জ্জী পাল এণ্ড কোং

২৬নং নির্ম্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

"Be and make"

let this be our motto.

— *Swami Vivekananda*

Space donated by

D. N. SINGHA & CO.

Manufacturers and Exporters of

Cast Iron materials.

HOWRAH CALCUTTA INDIA

সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য

সব কিছুই সুন্দর ও মোহন করে তুলতে আলোর প্রয়োজন। বেঙ্গল ল্যাম্পের ব্যাপ্তি ও জ্যোতি সকল ক্ষেত্রেই উজ্জ্বলতর প্রভা বিস্তার করে চারিদিক সুন্দর ও মোহন করে তোলে।

৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন
অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

দি বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্‌ লিঃ
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

"ধর্মকথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য
সমবায় আন্দোলনকে সমর্থন করুন।

বাটানগর এমপ্লয়ীজ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

বাটানগর, ২৪ পরগনা

চাল, চিনি, দুধ, কয়লা, কাপড়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রা এবং প্রয়োজনানুসারে ঋণ দানের ব্যবস্থা আছে।

আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি।

CHEETA

Another year has gone by, as prosperous as the last. We are grateful for the continued co-operation of old customers who still find Cheeta leather cloth the finest leather cloth available, because of its range of colours and striking designs, its durable quality, its rich, finished appearance. Repeat orders continue to come in and among new customers we now include TELCO. We are particularly gratified to see that Cheeta has established itself with the middle-class householder because it is so reasonably priced and wears so well. More and more homes are now being decorated with Cheeta upholstery. Cheeta has also expanded its scope of sales. From the home market it has gone overseas to U.K., the Far East, and East Africa and has already built up a satisfied clientele in these highly competitive markets. Cheeta thanks its old patrons for their support and assures them of the same service and satisfaction they have received from Cheeta in the past. We hope that Cheeta's superior quality, its wide use and its popularity with all classes of buyers will introduce the "fastest selling leather cloth" to more new patrons in 1964.

be modern

decorate with CHEETA

the fastest selling

LEATHER CLOTH

ELPHINSTONE LEATHER (Plastic) CLOTH AGENCY

STOCKISTS & AGENTS :

ELPHINSTONE SPINNING & WEAVING MILLS CO., LTD., Bombay

Shop & Office :

4, CHANDNI CHOWK STREET *(Rexine Dept.)*

CALCUTTA-13

শ্রদ্ধা জানাই—

উৎসবে উপহারে শুভবিবাহে ও নিত্য প্রয়োজনে

সর্ব্বপ্রকার মিলের ও তাঁতের ধুতি, শাড়ী,
পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের
আধুনিকতম প্রতিষ্ঠান

দি আরতী ষ্টোর্স

৯০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

for WATER SUPPLY

TRADE BISCO MARK

SELF OILING PUMPING UNIT

HAND PUMP STRAINER

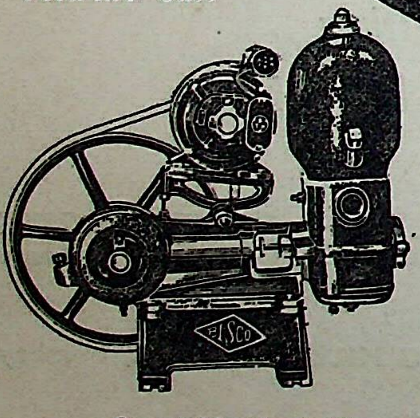

Operated by Electric Motor or Gasoline Engine.

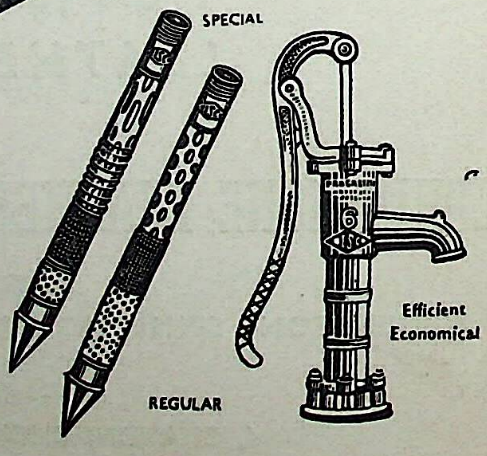

PROGRESSIVE ENGINEERING WORKS

51, DESHPRAN SASMAL ROAD, CALCUTTA-33

PHONES : H.O. 46-1871 Works : 56-3262 GRAM : STHAPATI, CAL.

অতুলনীয় !

শার্প-ঝঙ্কার রেডিয়ো

৪-ব্যাণ্ড, ৯-ট্রানজিস্টার
সুন্দর চামড়ার কেস সমেত
দাম মাত্র ৪৩০৲ টাকা
(বিক্রয় কর ছাড়া)

শুধু ট্রান্‌জিস্‌টর সেট নয়—নানাবিধ ভ্যাল্‌ভ সেটও আছে। প্রত্যেকটি সেট রূপে, গুণে, স্থায়িত্বে সব দিক থেকে সত্যিই তুলনাহীন !

একমাত্র পরিবেশক

রেডিয়ো সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩, ড্যালহাউসী স্কোয়্যার
কলিকাতা-১

—"প্রত্যেক নর-নারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে—তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

দেশের ও দশের সেবায়

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

হেড অফিস ঃ—কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—ভারতের সর্ব্বত্র

জয়দেব

মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ডায়মণ্ডহারবার
২৪ পরগনা
(থানার সন্নিকট)

প্রসিদ্ধ হিমশীতল দধি, সন্দেশ, চম্‌চম্‌, ছানা ও মিষ্টান্নাদি বিক্রেতা ও সরবরাহকারক

★

প্রোঃ ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

Phone : 23-2149 (Shop)
23-6734 (Office)

Our respectful homage to Swami Vivekananda, the Architect of New India :

SHAW BROTHERS STORES (Private) LIMITED

Distributors of :

JOHNSON'S PRODUCTS
&
CORN PRODUCTS

12 & 13, BERTRAM STREET,
CALCUTTA 13

ESTD. 1892 PHONE : 24-1967

BIDHU BHUSAN GHOSE & SONS

Iron, Asbestos & Hardware Merchants.

31, NIRMAL CHUNDER STREET,
CALCUTTA - 12

বিধুভূষণ ঘোষ য়্যাণ্ড সনস্

প্রসিদ্ধ লৌহ, অ্যাসবেস্টস্ সিট ও ফিটিংস
বি ক্রে তা।

৩১, নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মণ্ডল ব্রাদার্স

সরিষাহাট, ২৪ পরগনা

ডাল, কলাই, তৈল ও সকলপ্রকার মশলা-সামগ্রী
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
কলিকাতার দরে সর্ববিধ দ্রব্যাদির খুচরা
ও পাইকারী বিক্রেতা।

সত্বাধিকারী—
শ্রীসাগরচন্দ্র মণ্ডল

Phone : 47-2978 & 47-5484 :

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

Our respectful homage to
Swami Vivekananda,
The great and glorious saint of India
on his
Birthday Centenary.

WEST ELECTRICAL WORKS

12, KALIGHAT ROAD
CALCUTTA-25

SHOW ROOM : 17, KALIGHAT ROAD

Telegram : "DUTTJEECEE" Phone : 22-1055

GOCOOL CHUNDRA DUTT & CO.

Stationers & Quality Printers

1, MISSION ROW
CALCUTTA - 1

Printing Works :

DRACON PRINTING WORKS

32/B, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA - 12

The Automobile & Electric Corporation

10, British Indian Street,
Calcutta - 1

DIRECT IMPORTER OF AUTOMOBILE
SPARE PARTS & ACCESSORIES
MANUFACTURER & DISTRIBUTOR
OF ROTER, CAP & GEAR
LEVER KNOB

"ভিতরে অদম্য শক্তি রয়েছে, শুধু 'আমি কিছু নয়' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস্।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম শ্রদ্ধার্ঘ

বসু এণ্ড কোম্পানী

গভর্ণমেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেক্‌ট্রিক্ কনট্রাকটর

১৮, এজরা ষ্ট্রীট, রুম নং—২

কলিকাতা-১

ESTD : 1905 PHONE : 33-5562

For all Kinds of Dyes & Chemicals, Starch and Tata Glycerine Please Contact

RAMENDRA SAHA & SONS

10/1, Portuguese Church Street

Calcutta - 1

Ex-Main Distributors

I. C. I. (India) LTD

—: Stockists :—

THE TATA OIL MILLS CO., LTD.

J. C. COMPANY PRIVATE LTD.

16B, B. K. Paul Avenue,

Calcutta - 5

Manufacturers of

High Class Hosiery Than

Please ask for

Quality Hosiery Than

Tata Glycerine & Other Chemicals Etc.

Phone : 33-7326

THE CALCUTTA HARDWARE SYNDICATE

Importers, Manufacturers & General Order Suppliers

113, MANOHARDASS CHAWK, CALCUTTA - 7

Our Respectful Homage to the Glorious Saint and Savant on the occasion of his Birth Centenary.

With Compliments of :

Gram : VIKLPARTS — Phone : 24-3767

HIND MOTOR STORES & CO.

Automobile Specialists and Government Contractors

115-B, DHARAMTOLLA STREET,
CALCUITA-13

★

Dealers in :

AUTOMOBILE STORES & ACCESSORIES

কম সময়ে কম খাটুনিতে পাশ করিতে হইলে একখানা
SUGGESTIONS সংগ্রহ করুন ঃ

BY A BOARD OF EXAMINERS

1.	School Final Suggestions '64	4.50
2.	Higher Secondary Suggestions '64 Hum. Science & Com. each ...	6.00
3.	P. U. Suggestions (C.U., B.U., N.U.) '64 Art, Science & Com. each	5.00
4.	3-yr. Degree Suggestions Part—I (Arts) 64	6.50
5.	Do. Commerce (Part—I) '64	6.00
6.	B.A. Suggestions (old course) '64	7.00
7.	B. Com. Suggestions (old course) '64	7.00
8.	3-yr. Degree Suggestion (Part I) B.U. '64	7.00
9.	3-yr. Degree Suggestion (Part II Arts) C.U. '64	4.00
10.	Do. Commerce (Part II) '64	6.00
11.	বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ—ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র	১০৲

B. SARKAR & CO.

15, College Square, Calcutta-12.

Gram : KEJIMOTOR. Phone : 23-4105

We pay our respectful homage to Swami Vivekananda,
the patron saint of India

M/S. K. G. INDUSTRIES & MOTOR PARTS CO.

6/1-A, BRITISH INDIAN STREET,
CALCUTTA - 1.

Manufacturers and Dealers of U Bolts, Shackle Pins, Springs and Spring heaves for all types of Vehicles and Machines.

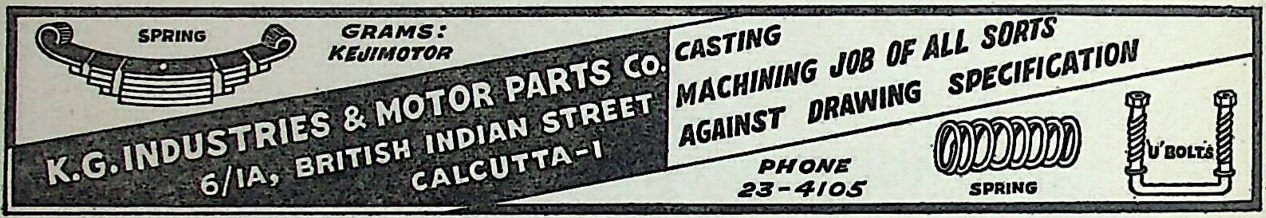

With Compliments from the manufacturers of

PAL ALLOY STEEL

SPRINGS
for Cars, Trucks, Jeeps and Buses

BHARAT COMMERCIAL ENTERPRISES

26, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA - 12

Phone : 23-3571 **Gram : MOTOIMPCO**

নগদ ও সহজ কিস্তিতে

রেডিও, পাখা, প্রেসার কুকার, সাইকেল, মোটর
পাম্প, ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়

লীতা ক্রেডিট করপোরেশন

৩০০, নেতাজী সুভাষ রোড
(চৌধুরী বাগান)
হাওড়া

টেলিফোন : {22-4497 / 22-6561 • টেলিগ্রাম : {Agrastons / Calcutta

এন্ সলোমন এণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

★

ধান-তেল-আটা-চিনি-কাঠ-কাটা কল, ট্রাক্টর,
পাম্পিং মেশিন-টিউবওয়েল-পাইপ-মোটর-
জেনেরেটার, মেট্রিক ওজন প্রভৃতি
সর্বরকম মেশিনারী বিক্রয়ের
একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান।

জয়ন্তী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরিষা আশ্রম মোড়

উৎকর্ষে ও রচনা-নৈপুণ্যে সত্যই উপাদেয়

পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং রসনা-তৃপ্তিকর মিষ্টান্নের
একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

★

জয়ন্তী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

আপনাদের সুপরিচিত—
সদা-দা

স্কুল, কলেজ, কো-অপারেটিভ সোসাইটি,
গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং পাব্লিক
লাইব্রেরীর সকলপ্রকার হিসাবের
খাতাপত্র এবং লিখন সামগ্রী
বিক্রেতা

ফোন : 34-6334

ছেলেমেয়েদের হাতে নির্ভয়ে তুলে দিন

বিমল দত্ত প্রণীত

শিশুসাহিত্য

রত্নখনির বিভীষিকা	সাত রাজ্যের রূপকথা	নিঝুমরাতের অট্টহাস
পিরামিডের গুপ্তধন	জাপানী ফানুস	ভৌতিক জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের রাজা	গ্যাস বেলুন	সহস্রমুখো শয়তান
লাফিং গ্যাস	টলস্টয়ের গল্প	সিংখুড়োর গল্প
আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্	শেক্সপীয়ারের গল্প	নিঝুমরাতের কান্না
য়্যাডাম্ বীড	সাইলাস মারনার	লাস্ট ডেজ্ অব পম্‌পেই

ওল্ড সেণ্ট পল্‌স : অলিভার টুইষ্ট্

ছোটদের বিদেশী গল্পগুচ্ছ : ডেভিড্ কপারফিল্ড

দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌লা ঠাকুর : ভাবের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য

গৌতম বুদ্ধ

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

বিশ্ববরেণ্য

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষে

অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

★

প্রসিদ্ধ চাউল-ব্যবসায়ী

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সরিষাহাট, ২৪ পরগনা

ফোন : ৪৫-৬১৭৪

নিয়োগী ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী

গবর্নমেণ্ট কণ্ট্রাকটারস

ও

অর্ডার-সাপ্লায়ার্স

স্লুইস্-গেট, লক্‌গেট ও বিভিন্ন ডিজাইনের
সকল প্রকার ষ্ট্রাকচারাল কাজ দক্ষতার
সহিত সম্পন্ন করা হয়।

★

৪৩, ডায়মণ্ড হারবার রোড

কলিকাতা-৩৮

"শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

আমাদের হৃদয়ের

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি—

শ্রীহলধর দে

শ্রীশান্তনু চৌধুরী

শ্রীমোহিনী মোহন ঘোষ

চৌধুরী এণ্ড কম্পানী

ক লি কা তা - ১

তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—**কর্মের**, কমলগুলি—**ভক্তির** এবং উদীয়মান সূর্যটি—**জ্ঞানের** প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Cover Engraved & Printed by Reproduction Syndicate, Calcutta-6